নয়না

প্রফুল্ল রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭২

প্রকাশক : মৈনাক বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রসাদ রায়

নকশা

সেই কখন থেকে একঝাঁক পাখি সঙ্গ নিয়েছে। মাথার ওপর চক্কোর দিয়ে দিয়ে তারা উড়ছিল, উড়তে উড়তে খুনসুটি করছিল। তাদের অক্লান্ত কিচিরমিচির, বাতাসে তাদের ডানা নাড়ার শব্দ আবছাভাবে শুনতে পাচ্ছিল নয়না।

কী পাখি ওগুলো? চোখ তুলে একপলক যে দেখে নেবে, তেমন উৎসাহটুকুও নয়নার নেই। অন্যমনস্কের মতন বড় বড় পা ফেলে সে হাঁটছিল।

জায়গাটার পাহাড়ী মেজাজ। এখানে দাঁড়িয়ে যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়—উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে অথবা পশ্চিমে—টিলা আর টিলা। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে বিলীন, মাটির ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউ ততদূর ছুটে গেছে।

টিলার ঢালে ঢালে কিছু আবাদ চোখে পড়ে। কোথাও আখের খেত, কোথাও কাঁকুড়ের, কোথাও যব বা শশার। মাঝে মধ্যে আনারসের চাষও দেখা যায়। আখের খেতে, যবের খেতে ফিনফিনে পাতলা ডানায় ফড়িং উড়ছিল—হাজার হাজার ফড়িং। একদল ছোট বগেড়ি পাখি তাদের পিছু নিয়েই আছে, সুযোগ পেলেই বাঁকানো ঠোঁটে একেকটা পতঙ্গ ধরে পটাপট গিলে ফেলছে।

দূরে শালবন, ফাঁকে-ফাঁকে পাকুড় এবং পলাশ। কদাচিৎ দু-চারটে দেবদারু। তবে যা প্রচুর দেখা যায় তা হল অর্জুন আর আঁওলা। পলাশগাছে ফুল নেই, ফুল ফোটানোর খেলা তাদের এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল নাকি?

মাটির রঙ এখানে লালচে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে এক অচেনা বিদেশিনী সারা গায়ে আবীর মেখে আলুথালু হয়ে শুয়ে আছে।

জায়গাটা বাংলা-বিহারের সীমান্তে, আলাদাভাবে দেখলে না-বাংলার, না-বিহারের। অথচ দুই রাজ্যের লাবণ্য আর রুক্ষতা, কাঠিন্য আর সুষমা তার স্বভাবে মাখানো।

আষাঢ় মাস যায় যায়। এখনো একফোঁটা মেঘের দেখা নেই। কবে যে আকাশ কালো করে মেঘেদের আনাগোনা শুরু হবে, কে জানে। এবারের বর্ষা বড় বিলম্বিত।

কত আর বেলা হয়েছে। এই তো খানিক আগে সূর্য উঠল। এরই মধ্যে নির্মল মেঘশূন্য আকাশ ধারালো নীল কাচের মতন ঝকঝক করতে শুরু করেছে। সেদিকে চোখ পেতে রাখে কার সাধ্য।

চলতে চলতে সামনের দিকে তাকাল নয়না। দূরে ঐ যে শালবন, নয়না খবর পেয়েছে, তারপর সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। জায়গাটার একটা নামও আছে—ঝামুরিয়া ফরেস্ট। আপাতত নয়না ওখানেই চলেছে।

ঝামুরিয়া ফরেস্টে যাবার অন্য একটা রাস্তাও আছে। সেখানে বাস-টাস মেলে। তবে সেটা ঘুরপথ। ওপথে গাড়িঘোড়ায় গেলেও আট-দশ ঘণ্টার আগে পৌঁছনো যাবে না। তাই সময় বাঁচাবার জন্য এই টিলার রাস্তা বেছে নিয়েছে নয়না। অন্তত দুপুরের আগে আগে তাকে স্টাডি ক্যাম্পে ফিরে আসতেই হবে। একবার যদি জানাজানি হয়ে যায় সে ক্যাম্পে নেই, চারদিকে হুলস্থুল পড়ে যাবে।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর কারোকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল নয়না। প্রফেসর-ইন-চার্জকে বললে হয়তো আসতে দিতেন না। কোথায় যাবে, কেন যাবে, যেখানে যাবে সেখানে কে আছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক কী, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন করতেন আর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারত না নয়না।

খুব ধরাধরি করলে কী হত বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেও হতে পারতেন প্রফেসর-ইন-চার্জ। তবে একা একা যে বেরুতে দিতেন না, তা একরকম নিশ্চিত। নিশ্চয়ই সঙ্গে কারোকে দিয়ে

দিতেন। অথচ এই মুহূর্তে কারো সঙ্গই কাম্য নয় নয়নার, ঝামুরিয়া ফরেস্টে সে একাই যেতে চায়, একেবারে একা। আর কেউ সঙ্গে গেলে তাকে ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হবে।

প্রফেসর ইন-চার্জের আর দোষ কী। নয়নাদের ভাল-মন্দের সব দায়িত্ব তো তাঁরই। তাঁরই ভরসায় অভিভাবকরা এতগুলো ছেলে-মেয়েকে মাসখানেকের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। কোন অঘটন-টঘটন যাতে না ঘটে, সেদিকে তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে বৈকি। একটা মাসের জন্য ভদ্রলোকের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। চোখ টান করে এতগুলো ছেলেমেয়ের দিকে তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

স্টাডি ক্যাম্প থেকে বেরুবার সময় একজনকে সামান্য আভাস দিয়ে এসেছিল নয়না। সে রাজেশ্বরী— রাজেশ্বরী সহায়। রাজেশ্বরী তার প্রাণের বন্ধু। মেয়েটা দারুণ চালাক, অসম্ভব বুদ্ধি ওর। কথা যখন বলে চোখে-মুখে খই ফোটে। যেমন হাসতে পারে, তেমনি হাসাতে। এই প্রাণবন্ত মেয়েটা যে পথে হাঁটে তার দু-ধারে খুশির ঘূর্ণি ঘুরতে থাকে। ক্লাসের বন্ধুটন্ধু থেকে শুরু করে প্রফেসররা পর্যন্ত সবাই ওকে খুব পছন্দ করে।

রাজেশ্বরীকে সব বলে নি নয়না। শুধু জানিয়েছিল একটু বেরুচ্ছে। যদি ক্যাম্পে খোঁজ পড়ে, রাজেশ্বরী যেন সামলে-টামলে নেয়।

রাজেশ্বরী বলেছিল, 'যাচ্ছিস কোথায় ?'

'ঐ যে মাঠটা দেখছিস, তার কাছাকাছি—'

'কাছাকাছি বলতে ?'

'ফিরে এসে বলব।'

'কেন, এখন বললে কী হবে ?'

'ঘণ্টা তিন চারেকের জন্য ধৈর্য ধরে থাক।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে রাজেশ্বরী। তারপর বলেছে, 'আচ্ছা। ফিরে এসে না বললে কিন্তু লাইফ একেবারে হেল করে ছাড়ব।'

'নয়না বলেছিল, 'করিস।'

রাজেশ্বরীকে এড়ানো গেছে। কিন্তু জয়ন্ত জানতে পারলে কিছুতেই একা একা আসতে পারত না নয়না, তার পিছু নিতই। চতুরলাল মিশ্রের কাছে আজ প্রথম দিনে কারোকে নিয়ে যেতে চায় না নয়না, কারোকেই না।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। দিনকয়েক আগে ইউনিভার্সিটির দুটো ডিপার্টমেন্ট, হিস্ট্রি আর বোটানির ক'জন অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্টাডি-কাম-এক্সকার্সানে বেরিয়েছেন। তাঁরা এসে ক্যাম্প করেছেন বাংলা-বিহারের সীমান্তে। সারি সারি তাঁবুগুলো দেখলে মনে হয় যুদ্ধের শিবির।

ইতিহাসের সঙ্গে উদ্ভিদতত্ত্বের শত্রুতা অবশ্য নেই। গাঁটছড়াও যে বাঁধা আছে, কিংবা একটা কোথাও গেলে আরেকটাকে তার পিছু নিতে হবে এমন কথা কোন জায়গায় লেখে না।

তবে হিস্ট্রি আর বোটানি যে হাত-ধরাধরি করে এখানে হাজির হয়েছে, সেটা যোগাযোগ মাত্র। বাংলা-বিহারের এই সীমান্তে ইতিহাসের কিছু কিছু মাল-মশলা ছড়িয়ে আছে, সেগুলো জিজ্ঞাসু ছাত্রদের কাজে লাগতে পারে। আবার এখানকার বন-জঙ্গলে উদ্ভিদ জগতের এমন কিছু আশ্চর্য নমুনার সন্ধান মিলেছে যার অস্তিত্ব ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীতেই বোধহয় নেই। তাই আপন স্বার্থেই বোটানি এবং হিস্ট্রির এই সহাবস্থান।

নয়না ইতিহাস আর পুরাতত্ত্বের ছাত্রী, তার ফিফথ্ ইয়ার। স্টাডি-কাম-এক্সকার্সানে আসার ক'দিন আগে মামার কাছে ঝামুরিয়া ফরেস্ট আর চতুরলাল মিশ্রের কথা শুনেছিল, সেই থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে সে। এখানে এসে প্রতিদিন ঝামুরিয়া ফরেস্ট যাবার সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগটা কিছুতেই আর পাওয়া যাচ্ছিল না। যখনই সে বেরুবার চেষ্টা করে, একটা না একটা বাধা এসে জোটে। আজ হঠাৎ সুযোগটা পাওয়া গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন একটা বড় টিলার মাথায় এসে উঠেছিল, নয়নার খেয়াল নেই। তলায় ছোট পাহাড়ী নদী, স্রোত নেই বললেই হয়। কাচের মতন স্বচ্ছ জলের তলায় বাদামী নুড়ি আর বালির বিছানা। ছোট ছোট অগুনতি মাছের ঝাঁক রুপোলি আঁশের ঝিলিক দিয়ে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে।

যদিও তলার নুড়ি-টুড়ি স্পষ্ট, নদীটা কতখানি গভীর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অথচ ঝামুরিয়া ফরেস্টে যেতে হলে নদী পেরুতেই হবে। যত গভীর হোক, নয়না ওপারে যাবেই। যেতে তাকে হবেই। এতটা এসে চতুরলাল মিশ্রের সঙ্গে দেখা না করে সে ফিরবে না। টিলার ঢাল বেয়ে নয়না নামতে লাগল।

নিচে এসে জলে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ কে ডেকে উঠল, 'নয়না—'

ভীষণ চমকে উঠল নয়না। স্টাডি-ক্যাম্প থেকে বেরুবার পর এতখানি রাস্তা এসেছে, একটা লোকও চোখে পড়ে নি। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। অন্যমনস্ক না থাকলে গা ছমছম করবে। মনে হবে চারদিকের নির্জনতা দম বন্ধ করে দিচ্ছে। এখানে কে তাকে ডাকতে পারে? এদিক-সেদিক তাকাতেই দেখতে পাওয়া গেল, টিলার মাথায় জয়ন্ত দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই সে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল নয়না। ভেবেই পেল না, জয়ন্তকে কে তার খোঁজ দিতে পারে? রাজেশ্বরীই কী? কিন্তু সে তো তেমন মেয়ে নয়। নাঃ, আর যাকেই পারা যাক, জয়ন্তকে ফাঁকি দেওয়া নয়নার অসাধ্য। হাজার চোখ মেলে সর্বক্ষণ সে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্টাডি-ক্যাম্প থেকেই কি জয়ন্ত তার পিছু নিয়েছে?

নয়না মুখ খোলবার আগেই জয়ন্ত বলে উঠল, 'মে আই কাম?'

যেন তার অনুমতি নিয়েই সব কাজ করে? এই যে পিছু নিয়ে এতদূর এসেছে, তাতেও যেন নয়নার কত সম্মতি ছিল। নয়না কিছু বলল না।

চোখমুখ কুঁচকে অত্যন্ত বিরক্তভাবে জয়ন্তকে দেখতে লাগল।

জয়ন্ত আর আক্ষেপ করল না; টিলার গা বেয়ে তর তর করে নেমে এল।

বেশ কঠিন সুরে নয়না বলল, 'তুমি এখানে!' এই মুহূর্তে কারো সঙ্গই তার ভাল লাগছে না।

জয়ন্ত উত্তর দিল না। তার বদলে পরিহাসের গলায় একটা কবিতা আউড়ে গেল :

'বসন্তে-শীতে দিবসে-নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে,
এ কঠিন প্রাণ চিরশৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে।
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।'

জয়ন্তের মুখে কবিতাটা আগেও অনেকবার শুনেছে নয়না। কথাগুলো চমৎকার। ভাষাটা বাংলা হলেও মানেটা তার জানা। কবিতাটা কার লেখা তা-ও সে জানে; জয়ন্তই তাকে বলেছে।

পাটনায় তারা যে মহল্লায় থাকে, সেখানে বংশ-পরম্পরায় অনেক বাঙালীর বাস। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বাঙালীই ওখানে বেশি, বিহারীরা সংখ্যালঘু।

যদিও নয়নারা মিথিলার শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ছেলেবেলা থেকে বাঙালীদের সঙ্গে মিশে মিশে বাংলা ভাষাটা ভালই বোঝে সে, বলতেও পারে। জয়ন্তর সঙ্গে বছর দুই আগে আলাপ; তার পর থেকে বাংলা ভাষায় প্রায় বিশারদই হয়ে উঠেছে নয়না। এখন তার উচ্চারণে জড়তা নেই; হঠাৎ তার সঙ্গে কথা বললে বাঙালিনী মনে হবে। বলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই, জয়ন্তরা বাঙালী।

নয়না নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলল, 'ওটা কিন্তু আমার কথার উত্তর হল না।'

জয়ন্ত শুধলো, 'কোন্‌টা ?'

'ঐ কবিতাটা। আমি যে এদিকে এসেছি, সে কথা তোমায় কে বলেছে ?'

'দু'জনে।'

বললে একজনই বলতে পারে, সে রাজেশ্বরী। দ্বিতীয় জন তবে কে ? মনে মনে রেগে যাচ্ছিল নয়না, আবার কৌতূহল বোধ না করেও পারল না। বলল, 'দু'জন বলতে ?'

নিজের দুই চোখ দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এরা।'

অন্য সময় হলে হেসে উঠত নয়না। এখন এই কৌতুক-টৌতুক ভাল লাগল না।

জয়ন্ত আবার বলল, 'আমার টেন্ট থেকে দেখলাম হন হন করে তুমি এদিকে আসছ। একেবারে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ; ঘণ্টায় ফিফটি মাইলস্ স্পীড। দেখেই—'

বাকিটা আর বলা হল না। সেটুকু নয়নাই পূরণ করে দিল, 'আমার পিছু নিলে, কেমন ?'

ঘাড় কাত করে জয়ন্ত হাসল, 'ইয়েস ইওর ম্যাজেস্টি।'

'কিন্তু…'

'কী ?'

জয়ন্তর চোখের ভেতর তাকিয়ে নয়না বলল, 'আর যাওয়া চলবে না ; এবার তোমাকে ফিরতে হবে।'

জয়ন্ত বলল, 'কোথায় ফিরব ?'

'কোথায় আবার, ক্যাম্পে।'

'নেভার।'

'ফিরতে তোমাকে হবেই।'

'যদি না ফিরি ?'

'ছেলেমানুষি কোরো না জয়ন্ত—' নয়নাকে খুব গম্ভীর আর রুক্ষ দেখাল।

নয়না কখনও এভাবে কথা বলে না। জয়ন্ত দারুণ অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা বুঝছ না কেন—'

'কী?'

'এই অচেনা জায়গায় একা-একা কোথাও তোমার যাওয়া উচিত না। বিপদ-টিপদ ঘটতে পারে।'

'কিসের বিপদ?'

'ওই শালবনের দিকে বাঘ-টাঘ থাকতে পারে।'

'আমি খোঁজ নিয়ে এসেছি, কিচ্ছু নেই।'

'খোঁজও নেওয়া হয়েছে এর ভেতর!'

'নিশ্চয়ই।'

'খুব হুঁশিয়ার মেয়ে দেখছি।'

নয়না উত্তর দিল না।

জয়ন্ত কি ভেবে আবার বলল, 'তবু—'

'আবার কী?'

এবার খুব রগড়ের গলায় জয়ন্ত বলল, 'কেউ তোমায় হরণও তো করে নিয়ে যেতে পারে।'

ধমকের গলায় নয়না বলল, 'ফাজলামো রাখো।'

একটু নীরবতা। তারপর জয়ন্ত বলল, 'ব্যাপারটা কী বল তো?'

'কিসের?' নয়না তাকিয়েই ছিল। তার চোখ তীক্ষ্ণ, জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল।

'এই সকালবেলা একা-একা চলেছ কোথায়?'

'আমার কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'সব কথা তোমাকে বলতে হবে?'

'বলাই তো উচিত।'

'কেন?'

চোখ ছোট করে, ঠোঁট কুঁচকে মজাদার ভঙ্গি করল জয়ন্ত। খানিকটা ঘন হয়ে গাঢ় ফিস ফিস গলায় বলল, 'ক'দিন পর 'যদিদং হৃদয়ং মম'-টমগুলো আওড়াতে হবে তো। আমার কাছে তোমার কিছু গোপন করতে নেই।'

কর্কশ সুরে নয়না ধমকে উঠল, 'আবার ফাজলামো!'

একটু দূরে সরে গিয়ে জয়ন্ত বলল, 'ক'দিন ধরে তোমার হয়েছে কী বল তো?'

'কী আবার হবে, কিচ্ছু না।'

'নিশ্চয়ই হয়েছে। এখানে আসার আগে থেকেই লক্ষ করছি, তুমি কেমন যেন অন্যমনস্ক। সব সময় কী ভাবছ। কিছু জিজ্ঞেস করলে ঠিকমতো উত্তর দাও না। আর—'

'আর কী?'

'আমার ওপর নির্দয় হয়ে উঠেছ।'

মনে মনে চমকে গেল নয়না। এক্সকার্সানে আসার ক'দিন আগে চতুরলাল মিশ্র আর ঝামুরিয়া ফরেস্টের কথা শুনেছিল। তখন থেকেই কি সে বদলে গেছে? পরিবর্তনটা এত স্পষ্ট যে অন্যের চোখেও ধরা পড়েছে? অসম্ভব নয়।

জয়ন্ত আবার বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, আমায় যদি না বল, বুঝব—'

'কী বুঝবে?'

'আমাকে ছেড়ে আর কারো—'

কথাটা শেষ করতে পারল না জয়ন্ত। তার আগেই জ্ঞানশূন্যের মত চিৎকার করে উঠল নয়না, 'অসভ্য, ইতর, জন্তু—তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার কোন সম্পর্ক নেই। খবরদার আমার সঙ্গে আসবে না।' উত্তেজনায় রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

নয়নার এমন ক্রুদ্ধ ভয়ানক চেহারা আগে আর কখনও ত্যাখে নি জয়ন্ত। যা সে বলেছে, নেহাতই মজা করবার জন্য। আগে এর চাইতে অনেক বেশি রগড় করেছে জয়ন্ত কিন্তু কখনও তো এরকম

রেগে যায় নি নয়না। বিমূঢ়ের মতন জয়ন্ত তাকিয়ে থাকল। সে জানে না, অজান্তে কোথায় কোন নিদারুণ সীমারেখায় তার পা পড়ে গেছে।

নয়না আর দাঁড়াল না, আয়নার মতন ঝকঝকে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

নদীর ওধার থেকে অনেকখানি জায়গা সমতল। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একবার পেছন ফিরল নয়না; নদীর পারে স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে আবার হাঁটতে লাগল নয়না। কেমন করে জয়ন্তকে সে বলবে, নিজের জন্মের উৎস খুঁজতে সে ঝামুরিয়া ফরেস্টে চলেছে। আর কারোকে এই মুহূর্তে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না।

দুই

সমতলের পর আবার টিলার রাজ্য।

উঁচু-নীচু মাটির ঢেউগুলো পাড়ি দিতে দিতে নয়না চতুরলাল মিশ্রের কথাই ভাবছিল। চারপাশের গাছপালা, যবের খেত, কাঁকুড়ের খেত, পাখি টাখি, এমন কি জয়ন্তর আহত স্তম্ভিত মুখটাও যেন তার ধারে-কাছে ছিল না। চতুরলাল মিশ্র ছাড়া আর কোন কথাই ভাবতে পারছে না সে।

নয়নার বয়েস এখন বাইশ। এই বাইশ বছরের জীবনে চতুরলাল মিশ্রকে একবারও ছাখে নি। এই সেদিন, এক্সকার্সানে আসার আগে মামার কাছে তাঁর যৌবনের একখানা ফোটো দেখেছে। অনেক কাল আগের তোলা; হলুদ ছোপ ধরে মলিন আর বিবর্ণ হয়ে গেছে ফোটোটা। তবু পাগড়ি-পরা মানুষটিকে বুঝতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় চোখ, ধারালো চিবুক, লম্বা ধাঁচের সুন্দর মুখ, জানু পর্যন্ত নেমে-আসা বাহু—ইত্যাদি দেখে মনে হয়েছিল, বেশ সুপুরুষ।

তবে বড্ড রোগা ; শরীরে লেশমাত্র মেদ নেই।

দেখতে দেখতে চমকে উঠেছিল নয়না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের চোখে-মুখে চেহারায় অবিকল ঐ মানুষটিরই আদল খুঁজে পাবে সে। যাই হোক, এ তো বহুদিন আগের ছবি। এখন চতুরলাল মিশ্রের চেহারা কেমন হয়েছে কে জানে! যাকে সে দেখতে চলেছে তার সঙ্গে ফোটোর মানুষটির আদৌ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি ?

মামা বলেছিল, 'এই তোর বাবা।'

বলামাত্র বুকের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল নয়নার। মন্ত্রোচ্চারণের মতন অস্ফুটে বলেছিল, 'আমার বাবা!'

'হ্যাঁ।'

'এখন তিনি কোথায় জানো ?'

'জানি—'

রুদ্ধশ্বরে নয়না জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় ?'

মামা বলেছিল, 'ঝামুরিয়া ফরেস্টে।'

'সেটা কোথায় ?'

'বাঙলাদেশ আর বিহারের বর্ডারে।'

রীতিমত অভিযোগের গলায় নয়না বলেছিল, 'এতদিন আমাকে বল নি কেন ?'

মামা বলেছিল, 'এতদিন তোর বাবার খোঁজ ছিল নাকি ? ক'দিন আগে আমার এক বন্ধু ঝামুরিয়া গিয়েছিল ; সে এসে বলল চতুরলাল ওখানে আছে। তোরা তো ইউনিভার্সিটি থেকে ওদিকেই এক্সকার্সানে যাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'গেলে তোর বাবার খোঁজ করিস।'

একটু চুপ করে থেকে রাগ, ক্ষোভ এবং অনুযোগ মিশিয়ে নয়না বলেছিল, 'বাবার ফোটো তোমার কাছে ছিল, আগে আমাকে দেখাও নি কেন ?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছিল মামা। বিষণ্ণ সুরে বলেছিল, 'দেখানোই উচিত ছিল রে—'

এ তো সেদিনের কথা। কিন্তু তার আগেও অনেকগুলো বছর আছে। চতুরলাল মিশ্রের কথা ভাবতে গিয়ে সেই দিনগুলোর কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে।

খুব ছেলেবেলাতেই নয়না জেনেছিল, তার মা আর সে মামাবাড়িতে থাকে।

পাটনায় মামাদের চকমিলানো দোতলা বাড়ি। বাড়িটার দুই মহল। একটা বাইরের দিকে, একটা অন্দরে। ঘরের মেঝেগুলো চৌকো চৌকো শ্বেত পাথরের। পেতলের শিক-বসানো ছোট ছোট কাঠের জানালাগুলোর গায়ে রঙীন কাচের পাল্লা। ছাদ পর্যন্ত লোহার মোটা মোটা শিক বসিয়ে দোতলার ঝুল-বারান্দাগুলোকে দুর্ভেদ্য করে ফেলা হয়েছে। দোতলায় উঠবার সিঁড়িগুলো ইট-সিমেন্টের না, কাঠের। দূর থেকে মনে হবে বাড়িটা যেন দুর্গ। আজকাল এরকম বাড়ি কেউ করে না।

বসবার ঘরে চেয়ার-টেবিল, সোফা-কৌচ নেই। তার বদলে তাকিয়া আর ঢালা ফরাসের ব্যবস্থা। এখানকার সব কিছুর মধ্যেই পুরনো আমলের গন্ধ মাখানো। পাটনা যখন রাতারাতি বদলে যাচ্ছে, তার গায়ে আধুনিকতার ছাপ পড়ছে তখন এই বাড়িটা কিন্তু প্রাচীনত্বকে প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারে নি; বরং দু হাতে আঁকড়ে আছে।

সারা বাড়িতে রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-হনুমান, কৃষ্ণ-ব্রহ্মা, এমনি অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি টাঙানো। আর ছিল অনেকগুলো পাখি—কাকাতুয়া, কোয়েল, টিয়া এবং খঞ্জন। কোনটা দাঁড়ে ঝুলত, কোনটা বা সুদৃশ্য তারের খাঁচায়।

খঞ্জন ছাড়া অন্য পাখিগুলো বোল শিখেছিল। কাকাতুয়াটা বলত, 'সীয়ারাম, সীয়ারাম।' কোয়েলটা বলত, 'মাঈজী, মাঈজী।' টিয়াগুলো কী বলত, এতকাল পর আর মনে নেই।

পাটনার বাড়িতে তখন মোটে পাঁচটা মানুষ। দাদু-দিদিমা, এক-মাত্র মামা, মা আর সে নিজে। মামার বিয়ের পর অবশ্য লোকজন বেড়েছিল। মামী এসেছিল, তার বছর বছর ছেলেপুলে হত। সব মিলিয়ে সাতটি মামাতো ভাই-বোন নয়নার। মামার বিয়ে, মামাতো ভাই-বোনদের জন্ম—এসব অনেক পরের ঘটনা।

সেই ছেলেবেলায় বাড়ির মানুষগুলোকে কেমন লাগত নয়নার?

প্রথমে দাদুর কথাই ধরা যাক। যুবক বা প্রৌঢ়, কোন অবস্থাতেই তাঁকে ছাখে নি নয়না। তখনই বেশ বয়েস হয়েছিল দাদুর, সত্তরের কাছাকাছি। একদা যে সুপুরুষ ছিলেন, তার কিছু ছাপ তখনও তাঁর সর্বাঙ্গে মাখানো।

সত্তর বছর বয়েসেও মাথা-ভর্তি চুল দাদুর। যদিও একটাও আর কাঁচা ছিল না, সব পেকে ধবধবে হয়ে গিয়েছিল। ভুরুতে, গোঁফে, কোথাও কৃষ্ণত্ব ছিল না। সবেতেই বয়েস তার শুভ্রতা মাখিয়ে দিয়েছিল। সোনার মত গায়ের রঙ তখন জ্বালি জ্বালি। বয়েসের ভারে ঈষৎ কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। হাতে সব সময় মলাক্কা বেতের একখানা ছড়ি থাকত। ওটা নেহাতই শোভা বাড়াবার জন্য। নইলে ছড়িতে ভর দিয়ে কোনদিন তাঁকে হাঁটতে ছাখে নি নয়না। এ ছাড়া সময় বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি তাঁর।

সেই বয়েসেও দাদুর চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য সজীব, বিনা চশমায় আধ মাইল দূরের জিনিস দেখতে পেতেন।

বয়েস তাঁর বাইরেই যা কিছু নখ বসিয়েছিল, ভেতরে ছায়া ফেলতে পারে নি। মানুষটি ছিলেন ভারি শৌখিন। সত্তরের কাছাকাছি এসেও ফিনফিনে ধুতি পরতেন, সিল্কের পাঞ্জাবি পরতেন। সোনার বোতাম, সোনার ঘড়ি, গলায় সরু হার তো ছিলই। গলায় থাকত সোনার চেন-হার। দু হাতে পাঁচ পাঁচটা আংটি ছিল। তার মধ্যে চারটেই নানা রকম পাথর-বসানো।—নীলা, চুনী, পান্না এবং মুক্তো। বিরুদ্ধ গ্রহকে স্বপক্ষে আনবার জন্য ওগুলো ব্যবহার করতেন দাদু।

বাইরের সব কিছু সাদা হয়ে গেলে কী হবে, ভেতরটা ছিল আশ্চর্য রকমের সবুজ, রসাল। সব সময় সেখানে রসের বান ডেকে থাকত। নয়নার দিকে তাকিয়ে দিনরাত মৈথিলী ভাষায় ছড়া কাটতেন, ছড়াগুলোর অধিকাংশই আদিরসের প্রান্ত-ঘেঁষা। পুরনো আমলের অগুনতি মজাদার কবিতাও তাঁর মুখস্থ ছিল; প্রায়ই সেগুলো আওড়াতেন। মাঝে মাঝে নাম-করা গাইয়ে এনে গানের আসর বসাতেন দাদু; তা ছাড়া রোজ সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে শতরঞ্জ খেলা তো ছিলই।

দাদু মানুষটা ছিলেন অত্যন্ত ভোজন-রসিক। খুব যে একটা খেতে পারতেন তা নয়। কিন্তু জগতের সেরা সুখাদ্যগুলো তাঁর পাতের চারধারে সাজিয়ে দেওয়া চাই-ই। কলকাতা থেকে সন্দেশ-রসগোল্লা মথুরা থেকে রাবড়ি, জামালপুরের কলাকন্দ, কাশীর প্যাঁড়া—এসব প্রায় রোজই আসত। খেতে বসে পছন্দমত খাবার না পেলে দাদুর মেজাজ যেত ভীষণ বিগড়ে। কতদিন দাদুকে থালা-বাটি ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছে নয়না।

দাদুরা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, মাছ-মাংস তাঁদের অস্পৃশ্য। কাজেই বাজারের সব চাইতে সেরা সবজি, ভাল ফল-টল, ভাল মাখন, ভাল ঘি এবং মেওয়া তাঁর বাড়িতে আসা চাই। কোন একটা লোভনীয় নিরামিষ খাবারের নাম কানে এলেই হল, তৎক্ষণাৎ রসুইঘরে ফরমাশ চলে যেত।

তার ওপর দুটো শৌখিন নেশা ছিল দাদুর। সিদ্ধি আর আফিম। এর জন্য দু'জন লোক রাখা হয়েছিল। সারাদিন তারা নিশ্বাস ফেলতে পারত না।

সে এক এলাহী কাণ্ড। প্রথমে সিদ্ধির কথাই ধরা যাক। ভাঙের পাতাগুলো আগে ঘিয়ে ভেজে বাটতে হত। কোনদিন ডাবের জলে, কোনদিন বা দইতে সেই বাটা ভাঙ গুলতে হত। তারপর দিতে হত নানারকম সুগন্ধি মশলা, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস আর ছোট ছোট বরাকের কুচি।

এত সব তরিবতের পর শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড গেলাসে বোঝাই

হয়ে সিদ্ধির সরবৎ দাতুর কাছে যেত। একটা চুমুক দিয়েই কোনদিন দাতু বলতেন, 'অখাদ্য।' কোনদিন বলতেন, 'মন্দ না।' কোনদিন বা তারিফের গলায় বলতেন, 'বা, বেশ হয়েছে।'

আফিমের ব্যাপারটা আরো সাঙ্ঘাতিক। যে লোকটাকে সেজন্য রাখা হয়েছিল, সারাদিনই প্রায় তাকে উনুনের ধারে পড়ে থাকতে হত। পনের সের দুধে একভরি আফিম দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। দুধ মরে মরে যখন তিন সেরে দাঁড়াত তখন তার নিষ্কৃতি। তিন সের হলে যে চওড়া হলুদবর্ণ সর পড়ত, রাতে সেটি খেতেন দাতু।

এ তো গেল দাতুর কথা। দিদিমা মানুষটা ছিলেন নেপথ্যচারিণী। সংসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। তিনি যে আছেন, সেটা কখনও টের পাওয়া যেত না। নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করে এভাবে আর কারোকে বেঁচে থাকতে ছাখে নি নয়না।

দাতুর বয়স যখন সত্তর, দিদিমার তখন ষাট। ষাটেই দাতুর তুলনায় একেবারে থুত্থুরে হয়ে গিয়েছিলেন দিদিমা, দিনরাতই বিছানায় শুয়ে থাকতেন। সারাদিন তাঁর কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেত না।

দাতুর বয়েস বছর চল্লিশ কমিয়ে দিলে যা দাঁড়ায় তাই হল মামা। চোখে-মুখে এবং দীর্ঘ ঋজু চেহারায় দাতুঃ আদল, দাতুর রঙ, দাতুর সব কিছু মুদ্রিত। দেখেই বলে দেওয়া যায় ওই বাপের এই ছেলে।

মামা কিন্তু দাতুর মতন শৌখিন না। ভাল পোশাক, ভাল খাবার, নেশা, শখ—কোনদিকেই তাঁর নজর নেই। যা হোক কিছু খেলেই হল, যা হোক কিছু পরলেই হল। কিছুটা উদাসীন ধরনের। এ জগতে মামা যেন পুরোপুরি সজ্ঞানে বেঁচে নেই। অন্যমনস্কের মতন তার চলাফেরা, কথাবার্তা।

মামার মনটা কিন্তু চমৎকার। রঙীন সুগন্ধময় ফুলের মতন সেটি ফুটে আছে। কাছে গেলে তার সৌরভ পাওয়া যায়। কে খেতে পেল না, কে পরতে পেল না, কার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে – এই রকম কত লোক যে জুটিয়ে আনত মামা! জামাকাপড় দিয়ে, খাবার দিয়ে, পয়সা-টয়সা

দিয়ে তাদের দুঃখ যতখানি পারত, ঘোচাতে চাইত। দাদু ঠাট্টা করে বলতেন, 'ব্যাটা নির্ঘাত সাধু-টাধু বনে যাবে। এবার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।'

সব শেষে মায়ের কথা।

দাদুর সঙ্গে চেহারার দিক থেকে মায়ের কোন মিলই নেই। অমন স্বর্ণবর্ণ পুরুষটির সন্তান হয়েও মা বেশ কালো। মুখ-চোখে বা গড়নে ধার নেই। সাধারণ, অতি সাধারণ মা ' মনেই হয় না এ বাড়ির মেয়ে।

দাদু, মামা, এমন কি থুথুরে দিদিমা বুড়ি—এ বাড়ির সবাই সুন্দর। তবু এই রূপের হাটে এলে প্রথমেই যাঁর দিকে নজর পড়বে তিনি মা। তাঁকে ঘিরে এমন একটা কিছু আছে যে প্রথমে না তাকিয়ে উপায় নেই।

মায়ের রূপ নেই, মা কালো। তবু তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বড় হয়ে নয়না বুঝেছে, অসীম দুঃখ মায়ের। সেটা তাঁর সারা গায়ে নানাভাবে লেখা আছে। এই দুঃখই তাঁর আকর্ষণ। এই দুঃখই তাঁর অলঙ্কার। দুঃখ বাদ দিয়ে মাকে কল্পনাই করা যেত না।

মায়ের মুখ সব সময়ই বিষণ্ণ, গম্ভীর। সারা দিনে দু-চারটির বেশি কথা বলতেন না। সেই স্বভাবটা এখনও আছে। নিজের চারধারে উঁচু-উঁচু দেয়াল তুলে মা যেন সর্বক্ষণ নির্বাসনে থাকতেন, এখনও থাকেন।

মা যেন চিরকালের এক রহস্য। সেদিনও তাঁকে বুঝতে পারত না নয়না, আজও পারে কী?

ছেলেবেলায় বড় বড় চোখ মেলে সবাইকে দেখত নয়না—মাকে, মামাকে, দাদুকে, দিদিমাকে। কিন্তু একটি মানুষকে কোথাও খুঁজে পেত না, সে তার বাবা। তার বয়েসী মহল্লার যত ছেলেমেয়ে, তাদের সবার বাবা আছে। তারই শুধু নেই। বাবার জন্য অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা অনুভব করত সে।

নয়না জিজ্ঞেস করত, 'আমার বাবা কোথায়?'

মামা বলত, 'জানি না।'

দাদু তখনও বেঁচে। বলতেন, 'সে নেই।'

দিদিমা বলতেন, 'রামজী জানে।'

মা কিছুই বলতেন না। তাঁর চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলতে থাকত। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ হঠাৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠত।

সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত রকমের দুর্বোধ্য মনে হত নয়নার। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু বাবার জন্য সেই ব্যাকুলতাটা কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। যত বড় হচ্ছিল নয়না ততই সেটা বেড়ে যাচ্ছিল।

যাই হোক, মামাদের ছিল বিরাট অবস্থা। আরা জেলায় তাঁদের মস্ত জমিদারি; সেখানে দু হাজার বিঘে ভাল ধানজমি ছিল। আর পূর্ণিয়া জেলায় ছিল বিশাল জঙ্গল-মহল। জমিদারি এবং জঙ্গল-মহল থেকে এক বছরে যা আয় হত, দশ বছর পায়ের ওপর পা তুলে বিশ হাতে খরচ করেও তা ফুরনো যেত না।

এত আরাম, এত সুখ, এত ঐশ্বর্য—তবু না-দেখা কাঁটার মতন বুকের ভেতরে সব সময় একটা দুঃখ ছিল। একটু একলা হলেই বাবার কথা ভাবতে বসত নয়না। মানুষটা কেমন দেখতে, কোথায় থাকেন, তাদের কাছে আসেন না কেন—এমন কত প্রশ্ন যে ভিড় করে আসত। তখন জগতের সব দুঃখী মানুষের সঙ্গে নিজের বড় মিল খুঁজে পেত নয়না। মনে হত, সে তাদেরই একজন।

মামাদের বাড়িটা পুরনো ধাঁচের; তার গায়ে প্রাচীন প্রাচীন গন্ধ মাখানো। একালের আলো-হাওয়া সেখানে ঢুকত না বললেই হয়। আসলে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হত না। যত রকমের সংস্কার আর রক্ষণশীলতা—সব সেখানে অনড় হয়ে ছিল।

দাদু বা মামা, খুব বেশি পড়াশোনা করেন নি। পুরুষদেরই যখন এই অবস্থা, মেয়েদের কথা না বলাই ভাল। স্কুল-কলেজের মুখ তারা

দেখতে পেত না ; বাড়িতেই যা দু-চার অক্ষর শেখানো হত। মোটামুটি চিঠি-পত্তরটা লেখা, রামায়ণ-মহাভারতটা পড়া—এই করতে পারলেই যথেষ্ট। তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়েস হলেই তাদের বিয়ে দেওয়া হত।

নয়নার কপালেও তাই ছিল। কিন্তু তার বয়েস যখন ছয়-সাত, মা বললেন, 'ওকে স্কুলে পাঠাব।'

দাদু অবাক, 'কী বলছিস তুই। এ বাড়ির মেয়ে কখনও স্কুলে-কলেজে গেছে!'

মা বলেছিলেন, 'ও যাবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ়।

'না-না, ওসব চাল চলবে না। তুই স্কুলে যাস নি, তোর পিসিরা যায় নি—তাতে কি আটকে গেছে। ইংরেজি কেতা শিখে মেমসাহেব না বনলেও ওর বর ঠিক জুটবে। দেখবি, নাত্নীর জন্যে স্বর্গ-মর্ত্য ঢুঁড়ে রাজপুত্তুর জুটিয়ে এনে দেব।'

মা এমনিতে মৃদুভাষিণী। সেদিন কিন্তু গলা উঁচুতে তুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'বাবা!'

দাদু চমকে গিয়েছিলেন, 'কী বলছিস?'

'পিসিদের কী হয়েছিল জানি না ; লেখাপড়া না শেখানোর জন্যে আমার কিন্তু আটকে গিয়েছিল। আর তুমি তা খুব ভাল করেই জানো বাবা।'

দাদু মায়ের দিকে তাকাতে পারেন নি। অপরাধীর মতন মুখ করে ক্লান্ত সুরে কী বলেছিলেন, বোঝা যায় নি।

মা আবার বলেছিলেন, 'তা ছাড়া একটা কথা তোমার খেয়াল নেই বাবা—'

'কী?'

'এই নয়নার সম্বন্ধে বলছিলাম।'

বুঝতে না পেরে দাদু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'নয়নার কী?'

মা বলেছিলেন, 'সে এ বাড়ির মেয়ে না।'

'নয় কিরকম!' পাকা ভুরুর তলায় দুই চোখ জ্বলে উঠেছিল দাদুর, 'জরুর এ বাড়ির মেয়ে। ওর বাপ, সেই হারামজাদা উল্লুটা ওর কোন্ দায়িত্বটা নিয়েছে শুনি?'

মা হেসেছিলেন, 'তবু ওকে কেউ এ বাড়ির মেয়ে বলবে না।

'আলবত বলবে। হাজারবার বলবে।' দাদু হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন।

মা এবার আর কিছু বলেন নি; স্থির দৃষ্টিতে দাদুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শুধু।

দাদুর সঙ্গে একরকম যুদ্ধ করেই তিনি নয়নাকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। সেদিনই নয়না প্রথম টের পেয়েছিল, তার স্বল্পভাষিণী মায়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে তিনি অজেয়; যেখান থেকে এক পা-ও তাঁকে পিছু হঠানো যায় না। এ সংসারের চিরাচরিত নিয়ম মায়ের হাতেই ভেঙেছিল।

নয়না যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে, দাদু বলেছিলেন, 'আর নয়। যথেষ্ট বিদ্যে হয়েছে। এবার ওর বিয়ের ব্যবস্থা করি। ভাগলপুরে একটা ভাল ছেলের খোঁজ পেয়েছি।'

মা প্রথমটা কিছু বলেন নি।

দাদু তাড়া দিয়ে বলেছিলেন, 'কি রে, মুখ বুজে আছিস যে?'

মা এবার বলেছিলেন, 'না।'

'না কি রে?'

'ও পড়বে।'

মায়ের 'না'-কে 'হ্যাঁ' করবার সাধ্য দাদুর নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে দাদু বলেছিলেন, 'তোর যা ইচ্ছে কর। মেয়ে তোর পণ্ডিতই হোক। তবে—'

'কী?'

'আমি বেঁচে থাকতে থাকতে ওর বিয়ে দিলে ভাল করবি।'

মা উত্তর দ্যান নি।

নাতনীকে পারেন নি; তবে ছেলেকে সেই বছরই বিয়ে দিয়েছিলেন দাদু। রীতিমতো ঘটা করে সারা পাটনা শহর জানান দিয়ে বিয়েটা হয়েছিল। তিন তিনটে ব্যাণ্ড পার্টি এসেছিল। আলোয় আলোয় বাড়িখানা যা সাজানো হয়েছিল। আর কত লোক যে খেয়েছিল তার হিসেব নেই। সারা পাটনা শহরটাকেই বোধহয় দাদু নেমন্তন্ন করে বসেছিলেন। যাই হোক, মামার বিয়ের ক'মাস পর দিদিমা মারা গিয়েছিলেন। দিদিমার মৃত্যুর পর খুব বেশিদিন বাঁচেন নি দাদু; বছর দেড়েকের ভেতর তিন দিনের জ্বরে নয়নাদের ছেড়ে চিরকালের মতন চলে গিয়েছিলেন।

মামার বিয়ের উৎসব এবং দাদু-দিদিমার মৃত্যুশোক কাটতে না কাটতেই দেখা গেল, নয়না স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে এসে পড়েছে।

বাবার জন্য ছেলেবেলার সেই ব্যাকুলতা ছিলই। এর মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে টুকরো টুকরো অনেক কথা শুনেছে নয়না। প্রতিবেশীরা বলেছে, মৃত্যুর আগে দাদু-দিদিমা কিছু কিছু বলেছেন, মামার মুখেও কিছু শুনেছে। একমাত্র মা-ই নীরব। তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা না-করা সমান। মা'র কাছে জগতের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়; শুধু একটা বাদে। বাবার সম্বন্ধে কোনদিন তাঁকে কিছু বলতে শোনে নি নয়না। এই একটা ব্যাপারে মা একেবারে চুপ।

বড় হবার পর বাবার সম্বন্ধে টুকরো টুকরো অসংলগ্ন যে কথাগুলো নয়না জানতে পেরেছিল তা মোটামুটি এই রকম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র আর বিদ্বান মানুষ। কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা করতেন।

জগতের সবার প্রতি বাবা সহৃদয়, কিন্তু মায়ের ব্যাপারে তাঁর ব্যবহার ছিল নাকি অন্যরকম। মাকে তিনি নিদারুণ উপেক্ষা করতেন; ভালভাবে কথাও বলতেন না। এক-আধদিন গায়েও হাত তুলেছেন। অমন সজ্জন ভদ্র মানুষটি মা কাছে গেলেই নাকি ইতর হয়ে উঠতেন।

মায়ের প্রতি এই উপেক্ষা, অবহেলা আর নির্দয়তার কারণ ছিল। কারণটা সুধা সিংহ।

সুধা সিংহকে নিয়ে নাকি কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন বাবা। স্ত্রী হয়ে তা চোখে দেখা যায় না। স্ত্রী কেন, আত্মসম্মান বোধ যার আছে তার পক্ষে ঐ রকম কুৎসিত ব্যাপার সহ্য করা অসম্ভব। মা-ও সহ্য করেন নি ; নয়নাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। সেই থেকে দাদুর এখানেই আছেন।

মা চলে আসার পর কলেজের চাকরি ছেড়ে বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। কেউ বলে সুধা সিংহ তাঁর সঙ্গে গেছে। কেউ বলে, না, একলাই গেছেন চতুরলাল মিশ্র। কিন্তু কোথায় গেছেন কেউ জানে না। পৃথিবী থেকে নিজের অস্তিত্ব যেন একেবারে মুছে দিয়ে বসে আছেন চতুরলাল।

সুধা সিংহর কথা শোনবার পর বাবার সম্বন্ধে নয়নার ধারণা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শ্রদ্ধা আর ভক্তির সিংহাসন থেকে এক ধাক্কায় চতুরলাল মিশ্রকে পথের ধুলোয় নামিয়ে দিয়েছিল সে ; মনে মনে তাঁকে নিদারুণ ঘৃণা করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু বাবার সম্বন্ধে এই মনোভাবটা সাময়িক। ক'দিন পরে সেই ব্যাকুলতাটা আবার অনুভব করতে শুরু করেছিল নয়না। নিজের উৎসকে খুঁজে বার করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বিপুল পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে চতুরলাল মিশ্র কোথায় হারিয়ে গেছেন, কে বলবে! কেউ তাঁর ঠিকানা জানে না।

দেখতে দেখতে নয়না আই. এ. পাস করল ; বি. এ. পাস করল। এখন সে পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্রী।

বাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিল নয়না। কিন্তু এই দিন কয়েক আগে মামার কাছে চতুরলালের কথা শুনেছিল, ফোটো দেখেছিল। এমন কি তাঁর ঠিকানাও পেয়েছিল।

ঠিকানাটা জানবার পর মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল নয়না। মা তখন দোতলার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে আকাশ দেখছিলেন।

কাঁপা গলায় নয়না ডেকেছিল, 'মা—'

মুখ না ফিরিয়েই মা সাড়া দিয়েছিলেন, 'কী বলছিস ?'

বুকের ভেতর তখন ঝড় বইছিল নয়নার। সে বলেছিল, 'বাবা কোথায় আছেন, জানতে পেরেছি।'

মা চুপ।

নয়না আবার বলেছিল, 'খোঁজ নেব ?'

মায়ের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত, 'না।'

মায়ের মুখের এই 'না' শব্দটার যে কতখানি শক্তি, নয়না তখনই বুঝতে পেরেছিল। তবু বারকয়েক চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু 'না' ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কিছুই বেরোয় নি।

এর ক'দিন পর স্টাডি টুরে তারা বাংলা-বিহার সীমান্তে এসেছে। আসতে আসতে নয়না স্থির করে ফেলেছিল, ঝামুরিয়া ফরেস্টে সে যাবে, যাবেই। মা রাগ করলে, করবেন। কিন্তু চতুরলাল মিশ্রের সঙ্গে একবার তাকে দেখা করতেই হবে।

তিন

কতক্ষণ হেঁটেছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বনমোরগের চিৎকারে চকিত হয়ে উঠল নয়না। চনমন করে চারদিকে তাকাতেই বুঝতে পারল, টিলার রাজ্য আর শালবন পেরিয়ে ঝামুরিয়া ফরেস্টে এসে পড়েছে।

এই মুহূর্তে নয়না যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা একটা সরু পথ। তার দু' পাশে চেনা-অচেনা গাছের ভিড়। চেনার মধ্যে সিমুল, বরগাছ, শাল, পলাশ, মহুয়া। বাকি যারা, তাদের কোনদিন চোখেও ছাখে নি নয়না, নামও হয়ত শোনে নি। জয়ন্ত থাকলে টকাটক ওদের নাম-টাম বংশ-পরিচয় বলে দিতে পারত। জয়ন্ত বোটানির ছাত্র।

২ মাথার ওপর ডালপালা আর পাতার চাঁদোয়া। সেটা এত ঘন যে

এই বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায় না। এখন কত বেলা, বোঝবার উপায় নেই। স্টাডি-ক্যাম্প থেকে বেরোবার সময় ঘড়িটা হাতে বেঁধে আসতে ভুলে গিয়েছিল নয়না। যদিও ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ এসে পড়েছে, তবু চারদিক ছায়াচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকার যেন এখানে অনড় হয়ে আছে। বাতাস এখানে বড় ঠাণ্ডা ; গা যেন জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ নয়নার খেয়াল হল, যে পাখিগুলো মাথার ওপর খুনসুটি করতে করতে আসছিল, তারা নেই। কোথায় কখন তাকে ছেড়ে পাখিরা কোন দিকে চলে গেছে, কে বলবে।

জায়গাটা আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ। মাঝে মাঝে ঝিঁঝির কান্না শোনা যাচ্ছে বটে ; কিন্তু তা যেন এর নিস্তব্ধতাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ধারে-কাছে এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভেতর দিয়ে যতদূর চোখ যায়— তাকিয়ে তাকিয়েও একটি লোককে দেখতে পেল না নয়না। নীরব নির্জন বনভূমিতে দাঁড়িয়ে তার গা ছম ছম করতে লাগল। নিশ্বাসও আসতে লাগল আটকে আটকে। মনে হল, এভাবে একা এখানে আসার দুঃসাহস না করলেই ভাল হত।

জয়ন্ত তো সঙ্গে আসছিলই। নয়নাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। না ফেরালেই বোধহয় ভাল হত। সঙ্গে কেউ থাকলে অনেকখানি ভরসা পেত নয়না।

কিন্তু যা হবার, হয়েই গেছে। নয়না এখন কী করবে ? স্টাডি-ক্যাম্পে ফিরে যাবে ? পরক্ষণেই সে নিজেকে বোঝাল, এতদূর এসে চতুরলাল মিশ্রের একটা খবর না নিয়ে ফেরা যায় না। চোখকান বুজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতন নয়না সামনে পা বাড়িয়ে দিল। যা হবার হবে ; শেষ পর্যন্ত না দেখে সে ফিরবে না।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর নয়নার মনে হল, কেউ ডাকছে। চমকে পেছন ফিরতেই দেখা গেল, মাঝবয়েসী একটা দেহাতী লোক বড় বড় পা ফেলে তার দিকেই আসছে। নয়না দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝামুরিয়া

ফরেস্টে ঢোকবার পর এই প্রথম একটি মানুষ তার চোখে পড়ল।

কাছে এলে বোঝা গেল, লোকটা আদিবাসী জাতীয়। সম্ভবত ওঁরাও-টোঁরাও।

লোকটা অবাক বিস্ময়ে নয়নার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে ভাঙা হিন্দীতে বলল, 'মা-জী, আপ ইঁহা ?'

'হ্যাঁ। একটু দরকারে এসেছি।' নয়না বলল, 'কিন্তু তুমি কে ?'

'আমার নাম ধানোয়ার। আমি এখানে কাম করি, 'ফরিস গাড'।'

নয়না অনুমান করে নিল, 'ফরিস গাড' শব্দটা 'ফরেস্ট গার্ড'ই হবে। বলল, 'তোমাকে পেয়ে ভালই হল।'

'জী। লকীন—'

'বল—'

'এখানে কি দরকারে এসেছেন, বলছিলেন না ?'

'হ্যাঁ। আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি।'

'কিসকো ?

নয়না বলল, 'চতুরলাল মিশ্রকে। শুনেছি তিনি এখানে থাকেন।'

'জী।' ধানোয়ার বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পর ফিস ফিস করে বলল, 'মিশরজী এখানকার ফরিস অফসর। লকীন বহুত তাজ্জবকি বাত—'

'কিসের তাজ্জব ?'

'বিশ সাল আমি এখানে কাম করছি। আমি আসার আগে থেকে মিশরজী এখানে আছেন। লকীন এতগুলো সাল গুজর গেল, দুনিয়ার কোই আদমী তাঁর সাথ দেখা করতে আসে নি। এতকাল পর আপনিই শুধু এলেন। এটা তাজ্জবের বাত নয় ?'

যে মানুষ নিজের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে এই নির্জন বনভূমিতে আত্মগোপন করে আছেন, তাঁর ঠিকানা কোথায় পাওয়া যাবে ? আর ঠিকানাহীন একটি মানুষের কাছে আসা কিভাবেই বা সম্ভব ?

এই কথাগুলো ধানোয়ারকে বলা যায় না ; নয়না চুপ করে রইল।

ধানোয়ার বলল, 'মিশরজীর কাছে যাবেন তো মা-জী ?'

'হ্যাঁ—' নয়না ঘাড় কাত করল।

'চলুন।'

যেতে যেতে ধানোয়ার বলল, 'এ আপনি ঠিক করেন নি মা-জী—'

নয়না জিজ্ঞেস করল, 'কী ঠিক করি নি ?'

'একা-একা এই জঙ্গলে আসা। তার ওপর আপনি জেনানা—'

'শুনেছি এখানে বাঘ টাঘ নেই—'

'শের নেই, লকীন দাঁতাল-টাঁতাল আছে।'

নয়না উত্তর দিল না।

ধানোয়ার শুধলো, 'একটা বাত আমি বুঝতে পারছি না মা-জী।'

নয়না তাকাল, 'কী ?'

'আপনি এলেন কী করে ?'

উত্তরটা কৌশলে এড়িয়ে গেল নয়না, 'এই চলে এলাম।'

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর ধানোয়ার ডাকল, 'মা-জী—'

নয়না তক্ষুণি সাড়া দিল, 'বল—'

'একটা বাত পুছব ?'

'কী ?'

'গুস্‌সা হবেন না তো ?'

নয়না স্থির চোখে তাকাল, 'গুস্‌সা হবার মতন কিছু বলবে নাকি ?'

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে ধানোয়ার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নহী—নহী—'

'তা হলে বলে ফেল।'

'মিশরজী আপনার কে হন ?'

একটু ভেবে নিয়ে নয়না বলল, 'আপনার লোক।'

ঠিক সম্পর্কটা যে কী, তা নিয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করল না ধানোয়ার। তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা

কথা মনে পড়ে গেল নয়নার। চতুরলাল মিশ্র কি এখানে একা
থাকেন, না সুধা সিংহও আছে ?

পাটনায় নয়নার মামাবাড়ির পাশে উপাধ্যায়দের বাড়ি। উপাধ্যায়
গিন্নী তাকে বলেছিলেন, চতুরলাল মিশ্র সুধা সিংহকে বিয়ে করেছেন
তাই যদি হয়, সুধা সিংহ নিশ্চয়ই এখানে আছে। ধানোয়ারকে কি
কথাটা জিজ্ঞেস করবে ? বলবার জন্য বারকয়েক সঙ্গীর মুখের দিকে
তাকাল নয়না, কিন্তু চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। তার
মনের ভেতর এখন যা চলছে, বলি বলি করেও বলে উঠতে পারল না
ধানোয়ার কী বুঝল, কে জানে। বলল, 'মা-জী, আমায় কুছ বলবেন ?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল নয়না। এ কথা ধানোয়ারকে জিজ্ঞেস
করা যায় না। চলতে চলতে সুধা সিংহের ভাবনা ঘুর্ণিপোকার মত
অদৃশ্য দাঁতে তার বুকের শিরা কাটতে লাগল।

সুধা সিংহ যদি এখানে থাকে ? নয়না কি ফিরে যাবে ? কিন্তু
এতদূর এসে ফেরার কথা আর ভাবা যায় না। তার বদলে সুধা সিংহ
চিন্তাটা ডাকিনীর মতন তাকে পেয়ে বসল, আর দুরন্ত নিয়তির
মতন সামনের দিকে টানতে লাগল। এই টানের উল্টো দিকে পা
ফেলার শক্তি তার নেই।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর একসময় ধানোয়ার বলে উঠল, 'আমরা এসে
গেছি মা-জী। এই যে এটা 'ফরিস অফসরে'র কোঠি।'

নয়না তাকাল। স্নায়ুগুলো এই মুহূর্তে ঝিম ঝিম করছে। এলোমেলো
এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতন বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মাথার
দুপাশের রগদুটো পাগলা ঘোড়ার মতন সমানে লাফিয়ে চলেছে। মনে
হচ্ছে রক্তের চাপে ও দুটো ফেটেই যাবে।

হাত দশেক দূরে মাঝারি একটা টিলায় বাংলো ধরনের কাঠের
বাড়ি। সামনের দিকে ছোট্ট একটু বাগান। খুব যত্ন করে সেখানে
নানা রকমের দেশী-বিদেশী ফুল ফোটানো হয়েছে।

ধানোয়ার বলল, 'আসুন—'

সজ্ঞানে না, যেন ঘোরের মধ্যে পা ফেলে ফেলে বাগান পেরিয়ে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল নয়না, তার আগে রয়েছে ধানোয়ার।

ধানোয়ার ডাকল, 'সাহাব—সাহাব—'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'কৌন?'

'আমি ধানোয়ার। এক মা-জী আপনার সাথ দেখা করতে এসেছেন।'

'কে মা-জী?'

'আমি বলতে পারব না। আপনার রিস্তা লাগে, বলছেন।'

'রিস্তা!' এবার কণ্ঠস্বরটা খুব অবাক শোনাল।

ধানোয়ার বলল, 'জী—'

গলাটা আর শোনা গেল না। একটু পর ভেতর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখামাত্র চিনতে পারল নয়না। অবিকল সেই চেহারা। মাথায় শুধু পাগড়ি নেই; চেহারায় বয়সের সামান্য ভার পড়েছে। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় দাবার ছক। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ—ওটা খুব সম্ভব ক্লান্তির জন্য। মনে হয় চতুরলাল যুগ-যুগান্ত ঘুমোতে পারেন নি। এটুকু হেরফের না ঘটলে ভাবা যেত, সেই ফোটোর মানুষটিই যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য আরেকটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে। ফোটোতে যে দীপ্তি যে উজ্জ্বলতা নয়না দেখেছে, আসল মানুষটির মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। কপালে অসংখ্য রেখা। সেগুলো এত গভীর, মনে হয়, ছুরি দিয়ে কেউ চিরে চিরে দিয়েছে। মুখ গাঢ় বিষাদে মলিন। এই প্রৌঢ় মানুষটি যেন বহুদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তারপর পরাজিত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অসীম ক্লান্তির মধ্যে ডুবে যেতে শুরু করেছেন।

ধানোয়ার বলল, 'এই মা-জী—'

চতুরলাল মিশ্র একদৃষ্টে নয়নাকে দেখছিলেন। বললেন, 'কাকে চাই?'

নয়নার বুকের ভেতরটা অসহ্য কাঁপছিল। সেই থরথরানি যেন তার কণ্ঠস্বরে ভর করল। সে বলল, 'আপনাকে।'

'আমাকে তুমি চেন?'

'চিনি বৈকি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

চতুরলাল কিছু বললেন না, তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

চতুরলালের মনোভাব যেন বুঝতে পারল নয়না। বলল, 'আপনি আমাকে চেনেন না, এই তো?'

দ্বিধাগ্রস্তের মতন চতুরলাল বললেন, 'ঠিক অচেনাও তুমি নও। কোথায়—কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি, ঠিক মনে করতে পারছি না।' নিজের স্মৃতিকে তোলপাড় করে ফেলতে লাগলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, 'কোথায় তোমাকে দেখেছি বল তো?'

অসহনীয় এক আবেগ ঢেউয়ের মতন গলার কাছটায় দুলতে লাগল নয়নার। সে বলতে চাইল, 'কোথাও আমাকে ছাখেন নি, দেখার ইচ্ছাও হয় নি।' কিন্তু বলতে পারল না। গলার ভেতর কথাগুলো আটকেই থাকল; কিছুতেই সেগুলো বার করে আনা গেল না।

চতুরলাল আবার বললেন. 'কোথায় তোমাকে দেখেছি, বল না?'

অস্থির অস্ফুট গলায় নয়না বলল. 'আপনিই বলুন।'

একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিলেন চতুরলাল। থাকতে থাকতে ভূকম্পনের মতন সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে কী এক বিপর্যয় ঘটে গেল। অনেকখানি ঝুঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললেন. 'তুমি— তুমি কে?'

'আমি নয়না।'

'ওটা তো নাম। তোমার পরিচয় কী?'

'আপনিই বলুন।'

নীরবতা। তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। প্রায়

চিৎকার করে উঠলেন চতুরলাল, 'আমি অন্ধ—আমি অন্ধ। নিজেকেই আমি চিনতে পারি নি।' পরক্ষণেই নয়না টের পেল প্রৌঢ়র বুকের ভেতর ধরা পড়ে গেছে।

চতুরলাল বলতে লাগলেন, 'এবার বুঝতে পেরেছি। তুই যে আমারই চোখ-মুখ আর কম বয়েসটাকে সারা গায়ে ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস।'

নয়না কি বলতে চেষ্টা করল, পারল না। বুকের অতল থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে এসে খানিক আগের মতন গলাটাকে রুদ্ধ করে রাখল।

অনেকটা সময় বুকের ভেতর বন্দী থাকার পর মুক্তি পেল নয়না। চতুরলাল বললেন, 'ঘরে চল্ মা।'

ধানোয়ার বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়েছিল। অচেনা এই মা-জীর সঙ্গে সাহেবের সম্পর্কটা যে কী, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

ঘরে আসতেই দেখা গেল, চারদিক অগোছাল। জামা-কাপড়-জুতো-বাক্স-টাঙ্ক এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। একধারে ক'টা বেতের চেয়ার। চতুরলাল বললেন, 'বোস্ মা।'

নিঃশব্দে নয়না বসল।

চতুরলাল বললেন, 'আমি জানতাম আর কেউ না আসুক, তুই অন্তত আসবি। আমার কাছে তুই না এসে পারবি না।'

নয়না চুপ।

চতুরলাল আবার বললেন, 'তোর জন্যেই এতকাল পথ চেয়ে বসেছিলাম মা—'

এতক্ষণে স্বর ফুটল নয়নার। আবছা কাঁপা গলায় বলল, 'না।'

'কী না?'

'আপনি আমার জন্যে বসে থাকেন নি। মিথ্যে কথা।' ঠোঁট থর থর করছিল নয়নার; দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। চোখের ভেতর কোথাও কি একটা সমুদ্র লুকনো ছিল, সেটা উথলে উথলে এতক্ষণে

বেরিয়ে আসতে লাগল।

চতুরলাল লক্ষ্য করেছিলেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কাঁদছিস মা?'

নয়না উত্তর দিল না।

বিষাদের গলায় চতুরলাল বললেন, 'কেমন করে তোকে বোঝাই, মিথ্যে না। সত্যিই তোর জন্যে দিন গুনছিলাম।'

নয়না বলল, 'আপনি নিষ্ঠুর, আপনার হৃদয় নেই।' তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভাঙা-ভাঙা, জড়িত এবং শিথিল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন চতুরলাল, 'সে কথা তুই বলতে পারিস।'

হঠাৎ কী হয়ে গেল নয়নার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতন বলতে লাগল, 'আর কারো ওপর না থাক, আমার ওপরেও আপনার কর্তব্য থাকা উচিত ছিল। আমি কোথায় আছি, কিভাবে আমার দিন কাটছে, বেঁচে আছি না মরে গেছি—সে সব খোঁজ নেবার প্রয়োজনও আপনি বোধ করেন নি।'

'তুই ঠিকই বলেছিস।'

নয়না উত্তর দিল না।

চতুরলাল বিষণ্ণ হেসে বলতে লাগলেন, 'একদিন এসে তুই যে এসব কথা বলবি, আমি জানতাম। জবাবদিহির জন্যে আমি তৈরি হয়েই আছি। কিন্তু তার আগে আমার ক'টা কথার উত্তর দে—'

নয়না জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

চতুরলাল বললেন, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলি?'

কোথায় পেয়েছে, নয়না বলল।

'এখন তুই কোত্থেকে আসছিস?'

'স্টাডি-ক্যাম্প থেকে।'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকলেন চতুরলাল, 'স্টাডি-ক্যাম্প বলতে?'

নয়না বুঝিয়ে দিল।

দু' চোখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে চতুরলাল বললেন, 'তুই ইউনিভার্সিটিতে পড়িস না!'

'হ্যাঁ।'

'কী সাবজেক্ট?'

'হিস্ট্রি।'

'কোন্ ইয়ার তোর?'

'ফিফ্থ্।'

গলা নামিয়ে অনেকটা আপন মনে কথা বলার মতন চতুরলাল বললেন, 'আশ্চর্য তো! ও বাড়িতে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

কথাগুলো নয়নার কানে এসেছিল। চতুরলালের মনোভাব খানিক যেন আন্দাজ করতে পারল সে। ও বাড়ি বলতে মামাবাড়ি সম্বন্ধেই ইঙ্গিত দিয়েছেন চতুরলাল। তার মামাবাড়ি চতুরলালের শ্বশুরবাড়িও তো, সেখানকার হালচাল নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয়।

মামাদের বাড়িতে লেখাপড়ার চল নেই। ছেলেরা তবু দু-চার বছর স্কুলে যাতায়াত করে, মেয়েদের বেলায় ওটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মেয়েদের বিদ্যাচর্চা, মেয়েদের বাইরে বেরুনো—ওঁদের চোখে এসব খারাপ। নষ্ট হবার হাজার রাস্তা নাকি ও সবের মধ্যে খোলা রয়েছে। এ কালের মানুষ হয়েও চারদিকের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার জগতে ওরা বাস করছে।

এমন এক বাড়িতে থেকেও নয়না স্কুলে গেছে, কলেজে গেছে, এমন কি ইউনিভার্সিটির দেউড়িতে এসেও পা রেখেছে। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়?

নয়নার একবার ইচ্ছা হল, বলে, এর পেছনে মা। মা-ই একরকম জোর করে বাপের বাড়ির সব সংস্কার সব নিয়ম ভেঙে-চুরে তাকে আলোকিত জগতের সিংদরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। নইলে দাদু তো নিজেদের সংস্কার অনুযায়ী তাকে অশিক্ষিত করেই রাখতে চেয়েছিলেন,

মায়ের একটু উৎসাহ পেলে ষোল বছর বয়সে বিয়েও দিয়ে দিতেন। কথাগুলো নিমেষে ভেবে নিল বটে নয়না, বলল না।

মায়ের প্রসঙ্গ এখনও ওঠে নি। চতুরলাল যতক্ষণ না মায়ের কথা তুলছেন, নয়নাও কিছু বলবে না। দেখা যাক, মায়ের কথা কখন তোলেন চতুরলাল।

আশ্চর্য। কম সময় তো সে আসে নি, কথাও অনেক হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মায়ের সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞেস করেন নি চতুরলাল। মায়ের ব্যাপারে তাঁর সমস্ত আগ্রহ কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? জীবনে প্রথম বাবাকে দেখে নয়নার মন যতখানি কোমল হয়েছিল, এই মুহূর্তে আবার ঠিক ততখানিই কঠিন হয়ে উঠল। সাময়িক আবেগ কেটে যাবার পর মনের তলদেশ থেকে সেই পুরনো ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা লাফ দিয়ে উঠে আসছে নাকি?

চতুরলাল বললেন, 'ওসব কথা থাক। স্টাডি-ক্যাম্প থেকে তুই এখানে এলি কি করে?'

কিভাবে এসেছে, নয়না সংক্ষেপে বলল।

চতুরলাল অবাক, 'এতখানি রাস্তা টিলার ওপর দিয়ে একা একা চলে এলি?'

'হাঁ।'

'ভয় করল না?'

ভয় যে একটু-আধটু করছিল না এমন নয়। নয়না তা স্বীকার করল না।

'এখানে যে এলি, স্টাডি-ক্যাম্পে বলে এসেছিস?'

'না।'

চতুরলাল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ওরা খোঁজাখুঁজি করবে না?'

নয়না বলল, 'আমার এক বন্ধু জানে। খোঁজ পড়লে সে সামলে নেবে।'

'যাই বলিস এভাবে একা-একা আসা তোর উচিত হয় নি।'

ধানোয়ারও এই কথাই বলেছিল। নয়না বলল, 'বললে কেউ না কেউ সঙ্গে আসত।'

'সঙ্গে একজন কারোকে আনাই উচিত ছিল।'

'না।'

চতুরলাল অবাক হলেন, 'না কেন রে?'

'আমি—আমি—'

'আমি কী?' গাঢ় কালির ছোপের ভেতর দুই বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন চতুরলাল।

নয়না উত্তর দিল না।

মৃদু হেসে চতুরলাল বললেন, 'আমার সঙ্গে একা-একাই বুঝি বোঝাপড়া করে যেতে চাস, কি রে?'

চতুরলাল কি অন্তর্যামী? শুধু মাত্র নিজের জন্মের উৎসকে জানবার জন্য শালবন আর টিলার রাজ্য পাড়ি দিয়ে এতদূর আসে নি নয়না। সেটাই হয়তো আসল; মনের সামনের স্তরে এবং গভীরে আরো কিছু আছে তার। সেটা কিছুটা স্পষ্ট, অনেকখানিই আবছা। ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই একটা কথা মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণ এ বাড়িতে এসেছে কিন্তু আর কারোকেই তো দেখা যাচ্ছে না। আর কেউ যে আছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। বাড়িটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ। আর কেউ থাকলে চলাফেরার শব্দ কিংবা গলার স্বর একটু-আধটু নিশ্চয়ই শোনা যেত। তবে কি এখানে একাই থাকেন চতুরলাল মিশ্র?

উপাধ্যায়-গিন্নী জানিয়েছিল, সুধা সিংহকে বিয়ে করে চতুরলাল মিশ্র নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বিয়ে করে থাকলে, আর মহিলা যদি মারা গিয়ে না থাকে, নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আছে। হঠাৎ শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল নয়নার। মাথার ভেতরকার শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে লাফাতে লাগল। সেই অবস্থাতেই এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল সে।

ভেতরে ক'খানা ঘর, বোঝা যাচ্ছে না। তবে আরো অন্তত দুটো

যে আছে, সন্দেহ নেই। কেননা যে দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছে নয়না তা বাদে পেছনের দুই দেয়ালে দুটো দরজা রয়েছে। ঐ দুটো দরজার পর নিশ্চয়ই ঘর। ঘরগুলো অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, কেননা দরজায় পর্দা ঝুলছে। অবশ্য পর্দার ফাঁক দিয়ে ওই ঘরদুটোর অংশ বিশেষ চোখে পড়ছে কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

নয়না এসেছে, সুধা সিংহ কি তা টের পেয়ে গেছে? আর সেই জন্যেই সামনে না এসে ভেতরে আত্মগোপন করে আছে? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? সুধা সিংহ আগে আর তাকে দেখে নি, তার পরিচয়ও জানে না। হঠাৎ নয়নার মনে হল, অসম্ভবই বা কেন? চতুরলালের সঙ্গে এ ঘরে বসে সে কথা বলছে, ভেতর থেকে তা অনায়াসেই শুনতে পাওয়া যায়। কথাবার্তা শুনে কি আর তার পরিচয়টা টের পায় নি সুধা সিংহ? আর টের পেয়েই অন্য কোথাও সরে গেছে? তার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস মহিলার নিশ্চয়ই হবে না।

চতুরলাল বললেন, 'বোঝাপড়া পরে হবে। এতখানি পথ হেঁটে এসেছিস, নিশ্চয়ই খিদে-টিদে পেয়েছে, কী খাবি বল্? অবশ্য এই বন-জঙ্গলে খাবার-দাবার কী-ই বা পাওয়া যায়!'

তাঁর কথা যেন শুনতে পেল না নয়না। তার বুকের ভেতর অদ্ভুত রকমের একটা কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। হঠাৎ নয়না বলে ফেলল, 'আচ্ছা—'

'কী?'

'এ বাড়িতে ক'খানা ঘর?'

চতুরলাল অবাক, 'কেন বল্ তো?'

নয়না বলল, 'না, এমনি।'

'তিন খানা।'

'তিনটেই বেডরুম?'

'হ্যাঁ। তবে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করি না।'

'কেন ?'

'দরকার হয় না। তিনটে বড় ঘর ছাড়া কিচেন বাথরুম-টাথরুমও আছে।'

একটু ভেবে নয়না বলল, 'এখানে কে কে থাকে ?'

চতুরলালের চোখেমুখে ঢেউয়ের মতন কি খেলে গেল। হেসে বললেন, 'সব জানতে পারবি মা, আগে কিছু খেয়ে নে।' বলেই গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'টিরকে—টিরকে——।'

পর্দা ঠেলে ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এল, ধানোয়ারেরই মতন তার চেহারা। অর্থাৎ ওঁরাও-টোঁরাও জাতীয় আদিবাসী।

'মা-জী ছুপুরে খাবে, বুঝলি—'

'জী।'

'ভাল করে রান্না কর। সবজি-টবজি ঘিউ-টিউ আছে তো ?'

'জী।'

'কী সবজি আছে ?'

'আলু, কাঁকুড়, করেলা, পটল—'

'পপ্পড় আছে ?'

'জী ?'

'দুধ ?'

'নহী—'

'থোড়া দুধ ঔর কলা যোগাড় কর। আর গাড়ি নিয়ে বিষুণপুরের বাজারে যা ; কিছু মিঠাই নিয়ে আসবি।'

'জী—' ঘাড় কাত করল টিরকে।

নয়না এই সময় বলে উঠল, 'না-না, আমি একটু পরেই চলে যাব। দুপুরের ভেতর স্টাডি-ক্যাম্পে পৌঁছুতে না পারলে ভারি মুশকিল হবে। বন্ধুকে বলে এসেছি ওইরকম সময় ফিরব।'

চতুরলাল বললেন, 'কিছু মুশকিল হবে না, আমি তোকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসব। পৌঁছেই বা দিয়ে আসব কেন ? এই প্রথম তোকে

দেখলাম, বললেই কি ছেড়ে দিতে পারি? তুই আমার কাছে ক'দিন থাক। আমি স্টাডি-ক্যাম্পে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি '

'না। আমাকে ফিরে যেতেই হবে।'

'কেন?'

'স্টাডি ক্যাম্পে এসে এভাবে বাইরে থাকবার নিয়ম নেই।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া তো কর!' বলেই টিরকের দিকে ফিরলেন, 'এখন মা-জীকে কিছু খেতে দে। কী আছে ঘরে?'

টিরকে বলল, 'সেদিন শনিচারীর হাট থেকে ফল এনেছিলাম; তার কিছু আছে।'

'নিয়ে আয়।'

খাবার-টাবার দিয়ে টিরকে চলে গেল।

কোমল সস্নেহ গলায় চতুরলাল বললেন, 'খা মা—'

অন্যমনস্কের মতন খেতে লাগল নয়না। তার চোখদুটো কিন্তু স্থির নেই। চঞ্চলভাবে ভেতর দিকে উঁকি দিতে লাগল।

চতুরলাল হয়ত লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'কী দেখছিস?'

চমকে তাড়াতাড়ি খাবারগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ল নয়না।

চতুরলাল আবার বললেন, 'কাকে যেন খুঁজছিস তুই—'

নয়না কিছুতেই বলতে পারল না, সত্যিই খুঁজছে। ঘাড় গোঁজ করে সে খেয়ে যেতে লাগল।

মুখ তুললে নয়না দেখতে পেত, চতুরলাল হাসছেন। সে হাসি করুণ, বিষণ্ণ, মলিন—কান্নারই ছদ্মবেশ হয়ত।

খাওয়া হয়ে গেলে চতুরলাল বললেন, 'চল্ মা, বাড়িটা তোকে ঘুরিয়ে দেখাই—'

চতুরলাল তাকে ধরে ফেলেছেন। তার মনে কোন্ ঢেউ উঠছে, কোন্ ঢেউ পড়ছে, কিছুই আর তাঁর কাছে বোধহয় গোপন নেই। নয়না বিব্রত বোধ করল। মুখ নীচু করেই বলল, 'ঘুরে আর কী দেখব।'

'বা রে, আমি কোথায় কিভাবে থাকি তা বুঝি তোর দেখতে ইচ্ছে করে না! আয়—আয়—'

একরকম জোর করেই নয়নাকে নিয়ে উঠে পড়লেন চতুরলাল।

বাংলোটা আর কতটুকু! মোটে তিন খানা ঘর। যে ঘরটায় প্রথমে এসে নয়না বসেছিল, সেটা বসবার। বাকি রইল দুটো। তার একটা শোবার ঘর। উঁচু তক্তপোশে এলোমেলো বিছানা, পাল্লা ভাঙা একটা আলমারি ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। তৃতীয় ঘরখানা বইতে ঠাসা। নয়না শুনেছে, চতুরলাল দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। দর্শন ছাড়া দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব—এমনি কত বিষয়ের বই যে চারদিকে ছড়ানো! এই তিনটে ঘরের ঠিক পেছনে নীচুমতন একটা জায়গায় আছে বাথরুম, রান্নাঘর। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুরলালের সঙ্গে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছে নয়না। আর স্নায়ুগুলো টান টান করে চারদিকে নজর রাখছে। চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না সে। কোথাও সামান্য আওয়াজ-টাওয়াজ হলে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে।

বাড়ি দেখাতে দেখাতে চতুরলাল বললেন, 'জানিস মা—'

দূরমনস্কের মতন নয়না বলল, 'কী বলছেন?'

'এখানে আমার কুড়ি-একুশ বছর কেটে গেল। কবে যে ঝামুরিয়া ফরেস্টে এসেছিলাম, আজ আর মনেও পড়ে না।'

নয়না উত্তর দিল না। ঘরের কোণে, চারদিকের যত অন্ধিসন্ধি—সব জায়গায় সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু বৃথা—বৃথা—বৃথাই। রান্নাঘরে টিরকে ছাড়া বাড়িতে আর কারোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে কি সুধা সিংহ এখানে নেই?

চতুরলাল আবার বললেন, 'তুই যেদিক দিয়ে এসেছিস সেটা হল পশ্চিম। পুব দিকে একটুখানি গেলে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে। অত কষ্ট করে টিলা-ফিলা পেরুলি, তার চাইতে যদি এদিক দিয়ে আসতিস... বাস-টাস পেয়ে যেতিস—'

কেন এদিক দিয়ে আসে নি, আবছাভাবে বলল নয়না। তার চোখ কিন্তু অস্থিরভাবে চারদিকে ঘুরতেই লাগল।

চতুরলাল আবার বললেন, 'ওই দিকে তাকা—ওই যে ওই দিকটায়--'

চতুরলালের আঙুল বরাবর সামনে তাকাল নয়না।

চতুরলাল বললেন, 'ওটা দক্ষিণ দিক, আর ঐ যে ধোঁয়ার স্তূপের মতন দেখতে পাচ্ছিস—ওটা কী জানিস?'

নিস্পৃহ উদাসীন মুখে নয়না বলল, 'না।'

'ওটা একটা পাহাড়। এখান থেকে হেঁটে গেলে ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। পাহাড়টার মাথায় চমৎকার একটা ফল্‌স্ আছে।'

'ও—' আগের মতনই নয়নার গলা উদাসীন। দক্ষিণের পাহাড় থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বাড়িটার চারদিকে তাকাতে লাগল নয়না

'জায়গাটা বেশ সুন্দর, নারে?'

'হ্যাঁ।'

'তোর ভাল লাগছে?'

নয়না উত্তর দিল না।

'আমার কিন্তু এইরকম নির্জন জায়গা খুব ভাল লাগে। কত কাল আছি, তবু একঘেয়ে হয়ে যায় নি।'

একটু নীরবতা। তারপর চতুরলাল বললেন, 'চল্, ঘরে গিয়ে বসি।

তাঁর পিছু পিছু এবার শোবার ঘরে বসল নয়না।

বাইরে অল্প অল্প হাওয়া দিয়েছে। এখন কত বেলা বোঝা যাচ্ছে না ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের যে টুকরোগুলো এসে পড়েছে সেগুলো দুলছিল। নিবিড় গাছপালার মাথায় পাখি ডাকছিল। শান্ত নির্জন বনভূমিতে বেলা বোঝা যায় না।

আবছাভাবে নয়নার মনে হল, দুপুরের ভেতর স্টাড়ি-ক্যাম্পে পৌঁছুতে না পারলে ভারি মুশকিল হবে। যা দেখা যাচ্ছে, বিকেলের আগে ফেরা অসম্ভব। ততক্ষণ কি রাজেশ্বরী প্রফেসর-ইন-চার্জের

চোখে ধুলো দিয়ে রাখতে পারবে ?

অমন একটা দারুণ সমস্যাও এই মুহূর্তে নয়নাকে বিচলিত করতে পারল না। হাল্কা ছায়ার মতন দেখা দিয়েই পলকে মিলিয়ে গেল। ঘুরে ফিরে সুধা সিংহর কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

চতুরলাল ডাকলেন, 'নয়না—'

নয়না তাকাল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

'কী ?'

'এতক্ষণ যাকে খুঁজলি তাকে পেয়েছিস কা ?'

নয়না চমকে উঠল, 'আমি—আমি ' আধফোটা জড়িত স্বরে সে কী বলল, নিজেই বুঝতে পারল না।

চতুরলাল হাসলেন, 'তোর তো লজ্জা পাবার কিছু নেই মা। লজ্জা যদি কিছু থাকে তা আমার।'

নয়না তাকিয়ে থাকতে পারল না ; আপনা থেকেই চোখ নত হল।

একটু চুপ করে থেকে চতুরলাল বললেন, 'যাকে তুই খুঁজছিস সে নেই।'

কী বলতে চান চতুরলাল ? নেই বলতে এখন হয়ত নেই। কোথাও গিয়ে থাকতে পারে, পরে ফিরবে কিংবা হয়ত মারা গেছে। যাই হোক, নয়না কিছু বলতে পারল না। মুখ তুলে তাকালও না।

এতক্ষণ নয়নার দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন চতুরলাল। এবার ধীরে ধীরে জানলার বাইরে ছায়াচ্ছন্ন নিঝুম জগতের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ঝিঁঝিদের একটানা ক্লান্ত করুণ বিলাপ এখনও চলছে ; হাওয়ায় হাওয়ায় রোদের টুকরো দুলছে, পাখিদের চেঁচামেচিও কানে ভেসে আসছে।

অনেকক্ষণ নীরবতা ; বাইরে চোখ রেখেই একসময় খুব আস্তে করে চতুরলাল ডাকলেন, 'নয়না—'

নয়না উন্মুখ হয়েই ছিল, তক্ষুণি সাড়া দিল।

চতুরলাল বললেন, 'আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা কী ?'

চকিত নয়না চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। অস্ফুটে বলল, 'সে কথা জানবার কি কোন প্রয়োজন আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে। জগতে আমার সম্পর্কে কে কী ভাবল না ভাবল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। লোকনিন্দা আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তুই আমার সন্তান, আমারই রক্তের অংশ। তোর মধ্যে নিজের কোন্ প্রতিমা গড়তে পেরেছি তা জানতে না পারলে আমার শান্তি নেই। একটা কথা মনে রাখিস নয়না—'

'কী ?'

'ছেলেমেয়ে হচ্ছে সেই আয়না যেখানে নিজের আসল ছবি ধরা পড়ে। বল্, আমার সম্বন্ধে কী ভাবিস তুই, বল্—' বলতে বলতে জানলার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে ব্যাকুলভাবে নয়নার দিকে তাকালেন চতুরলাল।

নয়না উত্তর দিল না।

চতুরলাল আবার বললেন, 'আমি শঠ, দুশ্চরিত্র, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অমানুষ · তাই না ?'

তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটি এইরকম একটা ধারণাই তৈরি করে নিয়েছিল নয়না। এবারও কিছু বলল না সে।

চতুরলাল বলতে লাগলেন, 'চিরদিন আমি তোদের প্রতারণা করে এসেছি, নিশ্চয়ই এ অভিযোগ তোর আছে। থাকাই উচিত। সত্যিই তো, তোদের কোন দায়িত্ব আমি পালন করি নি। কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেলেন।

নিজের অজান্তে নয়নার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'কিন্তু কী ?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না চতুরলাল। একটুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে শুরু করলেন, 'আমার সম্বন্ধে তুই কতটুকু জানিস, কী শুনেছিস—জানি না। তবে সবটা তোর জানা উচিত। যার রক্ত শিরায় শিরায় বয়ে বেড়াচ্ছিস সেই মানুষটা কেমন—কতখানি পাষণ্ড

—সন্তান হিসেবে তা না জানলেই নয়। একুশ বছর ধরে ছটফট করছি, তোর কাছে জবাবদিহি করে এবার হয়ত আমি হাল্কা হতে পারব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'তুই বড় হয়েছিস, লেখাপড়া শিখেছিস। একটা বয়েসে সন্তান তো বন্ধুই। শাস্ত্রেও তার অনুমোদন আছে। তোর কাছে কিছু লুকোব না, খোলাখুলি সব বলব।'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকল নয়না।

চতুরলাল শুরু করলেন :

'একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমাদের বাড়ি পূর্ণিয়া জেলায়। গ্রামের নাম জনকপুর। আমরা খুব গরীব ছিলাম। সম্বল বলতে ছিল আমাদের সামান্য কিছু জমিজমা, ছোট্ট টিনের একটা বাড়ি, আর গোটা দুই মোষ।

'সংসার আমাদের খুব বড় ছিল না। বাবা মা, আর আমরা চার ভাই-বোন। মোট ছ'জন।

'খেতে যা ফসল হ'ত তা আমাদের তিন মাসের খোরাকিও না। মোষের দুধ বেচে ক'টা পয়সাই বা পাওয়া যেত!

'সেই সস্তা-গণ্ডার দিনেও অভাব ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। সংসার চালাতে বাবাকে কত রকম উঞ্ছবৃত্তিই না করতে হ'ত। সকালবেলা কবিরাজি করতেন, দুপুরে পাঁজিপুঁথি বগলে করে, গঞ্জে চলে যেতেন, সেখানে খড়ি পেতে দেহাতী লোকদের ভাগ্যগণনা চলত। সন্ধেবেলা গঞ্জ থেকে ফিরে শুরু হত ঘটকালি। কোথায় কোন্ বিয়ের যোগ্য ছেলে-মেয়ে আছে, সব ছিল বাবার কণ্ঠস্থ। মাঝরাত পর্যন্ত তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন।

'কবিরাজি, জ্যোতিষী এবং ঘটকালি—এত রকম করেও আমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারতেন না বাবা। সপ্তাহে চারদিনের বেশি পেট পুরে খাওয়া জুটত না। বছরে আমরা ভাইরা পেতাম দুটো করে দড়িওলা

প্যান্ট আর দুটো জামা। শীতের সময় তার ওপর মোটা সুতির চাদর। বোনরা পেত ইজের আর সস্তা ছিটের ফ্রক। দুটো করে জামা-প্যান্টে কদ্দিন আর চলে। জোর ছ'মাস। তারপর ছিঁড়ে-টিড়ে গেলে সেলাই করে কিংবা তালি দিয়ে দিয়ে বাকি বছরটা চালাতে হত। এর থেকে আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস।

'সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ছোটাছুটির ফলে বাবার শরীর ভেঙে পড়েছিল। পাকা সোনার মতন রঙ পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল. পাঁজরার হাড়গুলো গুনে নেওয়া যেত। চোখের কোল আর গাল গিয়েছিল বসে। ছ ফুটের মতন লম্বা ছিলেন বাবা, শিরদাঁড়া বেঁকে কুঁজোমতন হয়ে গিয়েছিলেন। সবসময় তিনি ক্লান্ত, করুণ, অবসন্ন। ভার টেনে টেনে আর যেন পেরে উঠতেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ কষ্ট হত। মনে হত, একদিন বাবা হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়বেন; আর উঠবেন না।

'মায়ের চেহারাও ওই রকমই। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছিল রোগা হাড়-সার হাতে নীল নীল শিরাগুলো জেগে থাকত। শীর্ণ বুকট সব সময় ধুকপুক করত। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত ছিল না। মুখট কাগজের মতন সাদা। মা'র হাতে-গলায় বা কানে আমরা এক কুচি সোনা-রুপো কোনদিন দেখি নি। হাতে থাকত দুটো লাল কড়ের বালা। গলা-টলা বা কান—সব ফাঁকা।

'আমরা ভাই-বোনেরা ছিলাম ভারি লক্ষ্মী। যা জুটত তা সোনামুখ করে খেতাম। ছেঁড়া হোক, তালি-দেওয়া হোক সেলাই-করা হোক—মা যা হাতে তুলে দিতেন তা-ই পরতাম আমাদের কোন অভিযোগ ছিল না, বায়না ছিল না। শুধু বড়লোক চতুর্বেদী আর মুন্সীদের বাড়ির ছেলেরা যখন আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে মেওয়া কি কলাকন্দ খেত কিংবা দামী দামী নতুন জামাজুতো পরত, আমরা চার ভাই-বোন একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। আ ভাবতাম, চতুর্বেদী কি মুন্সীদের ছেলেদের মতন যদি আমরা খেতে

পেতাম, পরতে পারতাম! কিন্তু তা তো হবার নয়।'

একটানা এই পর্যন্ত বলে চতুরলাল নয়নার দিকে তাকালেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়েই থাকলেন। বললেন, 'তোর বোধহয় এসব ভাল লাগছে না।'

কোনরকম মন্তব্য না করে নয়না বলল, 'আপনি বলে যান। খারাপ লাগলে আমিই আপনাকে বলব।'

চতুরলাল বললেন, 'জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি না বললে আমার জবাবদিহি সম্পূর্ণ হবে না। অনেক ফাঁক থেকে যাবে। একটু ধৈর্য ধরে তোকে সব শুনতে হবে মা।'

নয়না উত্তর দিল না।

চতুরলাল আবার আরম্ভ করলেন:

'ভাই-বোনদের ভেতর আমি ছিলাম সবার বড়। বাবার সাধ ছিল, আমি লেখাপড়া শিখি, দশজনের একজন হই। হয়তো ভেবেছিলেন, এক-আধটা পাস দিতে পারলে চাকরি-বাকরি পেয়ে যাব। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালে সংসারের দুঃখ ঘুচে যাবে। খরচ চালাবার সামর্থ্য তো ছিল না, বাবা আমাকে বাড়ির কাছেই একটা ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

'যাই হোক, লেখাপড়ায় আমি ভালই ছিলাম। ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে গেলাম জুনিয়ার হাইতে, সেখান থেকে হাই স্কুলে। পড়াশোনার ব্যাপারে কোনদিন আমার খরচ লাগে নি। বৃত্তির টাকাতেই বরাবর চলে গেছে। মাস্টার মশাইরাও আমাকে খুব পছন্দ করতেন, ভালবাসতেন—সেটা আমার নম্র বিনয়ী স্বভাবের জন্য।

'স্কুলের শেষ পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট বেশ ভাল হল, ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপটাই পেয়ে গেলাম।

'রেজাল্ট বেরুবার পর বাবা যে কত খুশী হয়েছিলেন, কত গৌরবান্বিত, বলে বোঝাতে পারব না। জনকপুরের হেন মানুষ নেই, জনকপুর কেন, সারা পূর্ণিয়া জেলার কেউ বোধহয় বাকি ছিল না যাকে

বাবা আমার রেজাল্টের কথা জানান নি। জীবনযুদ্ধে জর্জর ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটির জীবনে সেই প্রথম বড় রকমের একটা জয় এসেছে। এ জয়কে চারদিকে না রটিয়ে তিনি পারেন নি। জনকপুরে সেদিন এমন একটা মানুষ ছিল না যাকে ডেকে ডেকে বাবা আমার স্কলারশিপের কথা বলেন নি। তাঁকে ঘিরে গর্ব আর আনন্দের বান ডেকে গিয়েছিল যেন।

'বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এবার কী করতে চাস বাবা?'

'আমি অন্ধ নই। সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেদিকেই চোখ ফেরাব শুধু সারি সারি মলিন উপোষী মুখ। আমি জানতাম গোটা সংসারটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বলেছিলাম, 'একটা চাকরি-বাকরি—'

'বাবা ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছিলেন, 'না।'

'কী না?'

'এত ভাল রেজাল্ট করলি, আর পড়বি না?'

'আমি চুপ।

'বাবা বলেছিলেন, 'কি রে, মুখ বুজে আছিস যে?'

'আস্তে করে বলেছিলাম 'আর পড়ে কী হবে?'

'বাবার চোখ অত্যন্ত করুণ দেখিয়েছিল, 'তার মানে?'

'আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি নি। মুখ নীচু করে বলেছিলাম, 'সংসারের এই অবস্থা! মোটামুটি একটা পাস তো করলাম। শহরে গিয়ে খোঁজ-টোঁজ করে দেখি, একটা চাকরি-বাকরি পাই কিনা—'

'বাবা জেদের গলায় বলেছিলেন, 'না।'

'এবার মুখ তুলে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'এখন তোমার চাকরি করতে হবে না।'

'কিন্তু—'

'তুই কী বলতে চাস, জানি। সংসারের কথা তো?'

'হ্যাঁ।'

'সে জন্যে তোকে চিন্তা করতে হবে না। সংসারের চিন্তা আমার। এত বছর যদি চালিয়ে থাকতে পারি, আর ক'টা বছর ঠিক চলে যাবে। তুই শুধু তোর পড়ার কথা ভাব।

'কিন্তু—'

'কিন্তু-টিন্তু না। আমার সংসারের জন্যে তোর জীবনটা আমি নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। যে সংসার আমি নিজে তৈরি করেছি তার সব দায়িত্ব আমার। তোকে যদি এক্ষুণি সংসারের চাকায় জুড়ে দিই নিজের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব চতুর।'

'অভিমানে দুঃখে আমার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। রুদ্ধস্বরে বলেছিলাম, 'এ সংসার বুঝি তোমার একার? আমার কোন দায়িত্ব নেই? আমার ভাই-বোন, আমার মা--' বলতে বলতে গলা বুজে গিয়েছিল।

'বাবা আমার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'বোকা ছেলে। নিশ্চয়ই এ সংসার তোরও। ব্যাপারটা কী জানিস বাবা, আমি মানুষটা খুব তুচ্ছই ছিলাম। আমার আশা ছিল খুবই অল্প, চাওয়া সামান্য। কিন্তু তুই আমার লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিস রে। আমার চাওয়াটাকে যে ক' হাজার গুণ বড় করে দিয়েছিস তা তুই জানিস না।'

'আমি?'

'ঠিক তুই না, তোর ঐ রেজাল্টটা।'

'বাবা কী বলতে চান, আমি যেন খানিক আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। উত্তর দিই নি।

'বাবা আবার বলেছিলেন, 'এখন যদি তুই চাকরিতে ঢুকিস কত আর মাইনে পাবি। আমি লেখাপড়া না জানতে পারি কিন্তু এটুকু বুঝি, কলেজের সবগুলো পাস দিয়ে নিলে মস্ত চাকরি পাবি, অনেক মাইনে হবে। এতদিন তো গেছেই, আর ক'টা দিন না হয় কষ্ট করি।

একটু কষ্ট করলে যদি বড় সুখ মেলে, তবে কেন করব না? বড় পাওনা হাতছাড়া করব, আমি কি এতই বোকা রে? যে কেউ আমাকে যা খুশি ভাবতে পারে, আমার হিসেব কিন্তু ঠিক আছে।'

'আমি চুপ।

'বাবা থামেন নি, 'এখানে তো কলেজ নেই। তুই কালই পাটনায় গিয়ে ভর্তি হয়ে যা।'

'এবার বলেছিলাম, 'তুমি তো ভর্তি হতে বলছ কিন্তু খরচ-টরচ কী করে চলবে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না।'

'বাবা বলেছিলেন, 'তোর পড়ার খরচ তো লাগবে না।'

'মাইনে না হয় না লাগল। হোস্টেলে থেকে পড়তে হবে; তার খরচ তো আছে। সে সব কোত্থেকে আসবে?'

'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তোকে অত চিন্তা করতে হবে না।'

'পরের দিন একরকম জোর করেই আমাকে পাটনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। ওখানে গিয়েই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম; থাকার ব্যবস্থা হোস্টেলে। আসার সময় পঁচিশটা টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন বাবা; টাকাগুলো কোত্থেকে যোগাড় করেছিলেন তিনিই জানেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি নি।

'দূর দেহাতের ছেলে আমি। আগে আর কখনও শহর দেখি নি। পূর্ণিয়া জেলার গ্রামখানাকে সারা গায়ে মেখে আমি যেন পাটনায় এসেছিলাম। কদমছাট চুলের মাঝখানে মোটা একটা টিকি; গলায় হলুদ রঙের মোটা পৈতার গুছি; জামাকাপড়গুলো বাড়িতে কাচা, ফলে ইস্তিরির বালাই নেই। গ্রামে থাকতে জুতোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, জুতো কেনবার পয়সাই ছিল না আমাদের। পাটনায় আসবার সময় বাবা এক জোড়া নাগরা কিনে দিয়েছিলেন, পায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাচা চামড়ার কামড়ে ছাল-টাল উঠে রক্তারক্তি কাণ্ড। পাছে কেউ গাঁইয়া ভাবে, সেই ভয়ে ক্ষতবিক্ষত পায়ে জুতোটা পরে থাকতাম আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতাম। তাতে আমি যে সবাইকে আরো

মজার রসদ যোগাতে শুরু করেছিলাম, এই সোজা কথাটাই সেদিন বুঝতে পারতাম না।

'মনে আছে, আমি পাটনার কলেজে আসবার পর একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিলাম। সহপাঠীরা আমার কিম্ভূত সাজ-পোশাক আর চলাফেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত আর হাসত। সার্কাসের ক্লাউন দেখে লোকের যেমন মজা হয় ওদেরও তা-ই হত।

'অন্য সবাই দূর থেকেই রগড় করত। কিন্তু মহেশপ্রসাদ বলে একটা ছেলে ছিল, তার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। যত রকমের বাঁদরামি একজন ভাবতে পারে, তার সবগুলোই ছোকরার মাথায় ঠাসা ছিল। আমাকে দেখলেই দুর্বুদ্ধির পোকাগুলো যেন তাকে কুট কুট করে কামড়াতে থাকত। সোজাসুজি কখনও সে আমার দিকে তাকাত না; ঠোঁট দুটো ছুঁচোর মতন সরু করে চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখত। মনে হত, ভ্যাংচাচ্ছে। ওকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকত।

'আমাকে নিয়ে মজা করবার জন্যে প্রতিদিন তার মাথায় নতুন নতুন ফন্দি খেলে যেত।

'কলেজে প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। দুপুরবেলা হোস্টেল থেকে খেয়ে-দেয়ে ক্লাসে গেছি, তখনও অধ্যাপক আসেন নি। মহেশপ্রসাদ (সেদিন তার নাম জানতাম না) অন্য ছেলেদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। আমাকে দেখেই তার চোখ কুঁচকে গেল, ঠোঁট ছুঁচলো হলো। পায়ে পায়ে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়াল সে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তারপর ডাইনে-বাঁয়ে, এপাশে-ওপাশে ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখতে লাগল। অন্য ছেলেরা সকৌতুকে তাকিয়ে ছিল। মহেশপ্রসাদ আমাকে দেখতে দেখতে তাদের ডাকল, 'ভাইসব, এদিকে এসো।' ডাকামাত্র ছেলের দল আমার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। যেভাবে ছেলেগুলো ছুটে এসেছে তাতে মনে হয়েছিল, সারা ক্লাস মহেশপ্রসাদের কথায় ওঠে বসে।

'তারপর মহেশপ্রসাদ করল কি, কখনও আমার জামা, কখনও টিকি, কখনও জুতো দেখিয়ে মজাদার গলায় বলতে লাগল, 'দেখ ভাইলোক ক্যায়সা টিকি, ক্যায়সা কুর্তা, ক্যায়সা নাগরা, ক্যায়সা বদন! কিয়া খুবসুরত! মালুম হোতা—'

'অন্য ছেলেরা মজার গন্ধ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কী কী?'

'মহেশপ্রসাদ গানের মতন সুরে বলেছিল, 'এক রাজকুমার আয়া রে! তালি বাজাও ভাইলোক, একদফে জোর তালি বাজাও! রাজকুমার আয়া রে—'

'আজ হাসি পায়, সেদিন কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, অকূল সমুদ্রে এসে পড়েছি। আমি গাঁইয়া দেহাতী ছেলে, কোনদিন শহরে আসি নি। এই অনাত্মীয় নির্দয় জগতে কেমন করে দিন কাটবে, ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে গেছি।

'যাই হোক, সে-ই ছিল শুরু। তারপর কতদিন কতরকমভাবে যে মহেশপ্রসাদ আমার পিছনে লেগেছে তার হিসেব নেই। হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে প্রফেসরের লেকচার শুনছি, নোট নিচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে ব্যাঙ ডেকে উঠল। চমকে পেছন ফিরতেই দেখতে পেতাম, মহেশপ্রসাদ। দাঁত বার করে বলত, 'চমকে গেলে নাকি?' আমি উত্তর দিতাম না। লক্ষ্য করতাম, অন্য ছেলেরা হাসছে।

'মহেশপ্রসাদ বলত, 'ব্যাঙের ডাকটা কিরকম তুলেছি বল তো?'

'আমি এবারও চুপ করে থাকতাম। মহেশপ্রসাদকে দেখলেই আমার এত অস্বস্তি হত যে একেক সময় ভাবতাম, পাটনা ছেড়ে দেশে ফিরে যাই। লেখাপড়া যা হয়েছে, হয়েছে। আর দরকার নেই।

'আরেকদিনের কথা বলি। সেদিন সবে ক্লাসে ঢুকেছি, মহেশপ্রসাদ কোত্থেকে ছুটে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। খুব অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'ভাই চতুরলাল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

মহেশপ্রসাদ এতকাল ঠাট্টা-বিদ্রূপই করেছে। কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে কোনদিনই আমার কাঁধে হাত রাখে নি। আমি ভয়ে ভয়ে

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ?'

'পকেট থেকে সুন্দরী তরুণীর একটা ফোটো বার করে মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'দেখ তো, চেহারাটা কেমন ?

আমি অবাক। বলেছিলাম, 'এ কার ফোটো ?'

'যারই হোক, দেখতে কেমন তাই বল না।'

'ভাল।'

'পছন্দ হয় ?'

'আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। জড়ানো গলায় কী উত্তর দিয়েছিলাম, নিজেই বুঝতে পারি নি।

'মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'এ হল ঝানুগড়ের রাজকুমারী, সেদিন তোমাকে রাস্তায় দেখেছে। তারপর থেকে নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে তোমাকে বিয়ে করতে না পারলে গলায় দড়ি দেবে বলেছে।'

'মহেশপ্রসাদের বাহিনী অর্থাৎ ক্লাসের ছেলেরা কোথায় ওত পেতে ছিল, পিল পিল করে বেরিয়ে এল। একসঙ্গে তারা চেঁচাতে লাগল, 'রাজী হয়ে যাও চতুরলাল, রাজী হয়ে যাও। শেষে মেয়েটা তোমার জন্যে মরবে ?'

'মহেশপ্রসাদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'না, কিছুতেই না চতুরলালের জন্য একটা জীব হত্যা হতে দেওয়া যায় না।'

'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছিলাম। পেছনে মহেশপ্রসাদরা হো-হো করে হেসে উঠেছিল। আর সেই হাসিটা আমার পেছন পেছন যেন তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল।

'সব চাইতে মারাত্মক ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার টিকি নিয়ে। টিকির ব্যাপার বলবার আগে আরেকটা কথা বলা দরকার। আমাদের কলেজটা ছিল কো-এডুকেশনের কলেজ। সে আমলে ক'টা মেয়ে আর কলেজে পড়তে আসত! কলেজে ঢুকবার বয়স হবার আগেই তাদের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যেত। আমাদের ক্লাসে ছিল মোট তিনটি মেয়ে—সারদা জয়সোয়াল, তারকেশ্বরী উপাধ্যায় আর সুধা সিংহ।

ঘণ্টা পড়লে প্রফেসরদের সঙ্গে তারা ক্লাসে এসে ঢুকত। সামনের দিকে একটা বেঞ্চ তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে তারা বসত, ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে প্রফেসরদের লেকচার শুনত। একটানা চার পিরিয়ড চলবার পর টিফিন। টিফিনের সময় মেয়েরা গার্লস্ কমনরুমে চলে যেত। তারপর আবার যখন ক্লাস বসত, প্রফেসরদের সঙ্গে ফিরে আসত।

'এবার টিকির কথাটা বলি। সেদিন পর পর দু পিরিয়ড চলবার পর থার্ড পিরিয়ড অফ গেল, প্রফেসর এলেন না। প্রফেসর আসবেন, এই আশায় মেয়েরা বসে ছিল। যাই হোক, সামনের দিকে উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রফেসরদের জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা। হঠাৎ মহেশপ্রসাদ করল কি, নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে এ পিরিয়ডটা ফাঁক গেল, প্রফেসর চ্যাটার্জি আসবেন না।' একটু থেমে আবার, 'শুধু শুধু বসে থেকে কী হবে? তোমরা যদি অনুমতি কর একটা ম্যাজিক দেখাতে পারি। সময়টা তাতে ভালই কাটবে—'

'ছেলেরা হৈ-চৈ করে উঠেছিল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—'

'প্রফেসর আসবেন না বুঝতে পেরে, মেয়েরা চলে যাচ্ছিল। ম্যাজিকের কথা শুনে নিঃশব্দে বসে পড়ল। তাদের তিন জোড়া চোখ মহেশপ্রসাদের দিকে।

'মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'প্রথমে তোমাদের তাসের খেলা দেখাই, কেমন?'

'ছেলেরা বিপুল উৎসাহে সায় দিয়েছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' মেয়েরা কিছু বলে নি। তারা ছেলেদের সঙ্গে ক্বচিৎ-কখনো কথা বলত। উৎসুক জ্বলজ্বলে চোখে মেয়েরা মহেশপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'পকেট থেকে তাস বার করে কিছুক্ষণ খেলা দেখিয়েছিল মহেশপ্রসাদ, তারপর বলেছিল, 'এবার অন্য খেলা।' বলেই সামনের একটা ছেলের কাছ থেকে লাল পেন্সিল চেয়ে নিয়েছিল। একই জায়গায়

দাঁড়িয়ে হাত ঘুরিয়ে ক্লাস-সুদ্ধ সবাইকে পেন্সিলটা দেখিয়ে মহেশপ্রসাদ আবার বলেছিল, 'ভাইয়েরা-বোনেরা, এই পেন্সিলটা আমার জামার পকেটে ঢোকাব। তারপর—'

'সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'তারপর কী ?'

'কিছু না বলে কায়দা করে পেন্সিলটা জামার পকেটে ঢুকিয়েছিল মহেশপ্রসাদ। সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলেছিল, 'আমার পকেটে যা ঢোকালাম তা তোমরা দেখেছ ?'

'সমস্বরে সবাই বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'কী ওটা ?'

'পেন্সিল।'

'ঠিক পেন্সিল তো ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—'

'মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'ওই পেন্সিলটাই এবার অন্য জিনিস হয়ে চতুরলালের পকেট থেকে বেরুবে।' বলেই আমার দিকে তাকিয়েছিল, 'চতুরলাল, তোমার ডানদিকের পকেটে কী আছে, বার কর তো।'

'চমকে পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম। মুঠোর ভেতর যা উঠে এসেছিল তা হল মোটা একগোছা চুল; অনেকটা টিকির মত। বিদ্যুৎবেগে আমার হাত চলে গিয়েছিল মাথার পেছন দিকে। কেন গিয়েছিল নিজেই জানি না। কিন্তু নেই, টিকিটা জায়গামতন ছিল না। পলকে বুঝতে পেরেছিলাম, এ মহেশপ্রসাদের কাজ। ক্লাস চলবার সময়, নাকি অফ পিরিয়ডে, কখন যে টিকিটা কেটে সে আমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল টের পাই নি।

'আমরা গোঁড়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, টিকি রাখা আমাদের ধর্মপালনের অঙ্গ। তার এরকম দুরবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারি নি; লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই গায়ে যেন ঝড়ের ঝাপটা এসে লেগেছিল। ক্লাস-সুদ্ধ সবাই হাসতে হাসতে একেবারে হুল্লোড় বাধিয়ে দিয়েছিল, 'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, এমন ম্যাজিক

আর দেখি নি।'

'মহেশপ্রসাদ আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দু পাটির সবগুলো দাঁত বার করে হেসেছিল।

'আমার ঠোঁট তখন থরথর করছিল, শরীরের সব রক্ত গিয়ে জমেছিল চোখে। মনে হয়েছিল, সে দুটো ফেটে রক্ত ছুটবে। ছেলেগুলোর চিৎকার, হাসি আর হাততালি থামছিল না—আমার কানে যেন তালা ধরে যাচ্ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, অন্ধের মতন মরিয়ার মতন যাকে সামনে পাই তাকেই আঘাত হানি, ভেঙে চুরমার করে দিই। এতদিন মুখ বুজে যত লাঞ্ছনা আর অপমান সয়ে গেছি, আমার মধ্যে সে সব একাকার হয়ে কখন যে বারুদের মতন জমা হচ্ছিল, জানি না। কিল-ঘুষিই হয়তো লাগাতাম কিন্তু তার আগেই একটা অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। চিৎকার, হল্লা আর নিষ্ঠুর নির্মম তামাসার মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল সুধা সিংহ। সে যে মেয়ে, সে যুগে মেয়েরা যে অনেকখানিই পর্দানসীন—সব ভুলে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যের মতন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এ সব কী?'

'ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয় যে হল্লা-টল্লা থমকে গিয়েছিল। সমস্ত ক্লাস স্তম্ভিতের মতন তাকিয়েছিল সুধা সিংহের দিকে। সুধা তখন গলার স্বর চূড়ায় তুলে বলে যাচ্ছিল, 'কী ভেবেছেন আপনারা? একটা নিরীহ ছেলের ওপর এভাবে অত্যাচার করার মানে কী?'

'মহেশপ্রসাদ এবং তার বাহিনী চুপ। আমিও কম অবাক হই নি। একটা মেয়ে যে আমার জন্যে এরকম প্রতিবাদ জানাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। বিমূঢ়ের মতন আমিও তাকে দেখছিলাম। কলেজে ভর্তি হবার পর এই মেয়েটাকে কতবার দেখেছি। কিন্তু তা খানিকটা অন্যমনস্কের মতন। এমনিতেই আমি ভীরু, কুণ্ঠিত, লাজুক। সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে সুধার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের পলক পড়ে নি।

'সুধা সমানে বলে যাচ্ছিল, 'আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি,

আপনারা ভদ্রলোকের পেছনে লেগে আছেন। ভাল করে ক্লাস করতে চান না, সব সময় ইতরামো করে ওকে অস্থির করে মারছেন। কী জাতীয় অসভ্যতা এগুলো! সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত। আপনারা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'অন্য ছেলেদের কথা না-ই বললাম। মহেশপ্রসাদের মতন ধুরন্ধর বাঁদর ছেলেও একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তার গালে কেউ যেন থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে। একটা উত্তরও দিতে পারছিল না সে; শুধু অবাক পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল।

'সুধা সিংহ এবার এক কাণ্ড করে বসেছিল। মেয়েদের বেঞ্চ থেকে ছুটে আমার কাছে এসে বলেছিল, 'চলুন আমার সঙ্গে—'

'ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কোথায়?'

'সুধা সিংহ বলেছিল, প্রিন্সিপ্যালের কাছে।'

'কেন?'

'কেন আবার, এ ইতরামো বন্ধ করা দরকার।'

'ক্লাসের একটি ছেলের বিরুদ্ধে প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করতে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বলেছিলাম, 'প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে কী হবে?'

'সুধা বলেছিল, 'যেতে আপনাকে হবেই। আসুন—'

'এই প্রথম সুধা সিংহের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিলাম। বলতে আপত্তি নেই, সে অসাধারণ রূপসী, গায়ের রঙ পাকা ধানের মতন, চিত্রা হরিণীর মতন চোখ, রাজহাঁসের মতন গলা, কোঁচকানো কোঁচকানো চুল চুড়ো খোঁপায় আবদ্ধ। ধারালো চিবুক, পানপাতার মতন মুখের গড়ন। ডান গালে মুসুর ডালের মতন একটা লাল জড়ুল। থুঁতের মধ্যে ঠোঁট দুটি কিছু ভারী। দীঘল টান-দেওয়া হাত, আঙুল —সব মিলিয়ে সে মনোহারিণী। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, মেয়েটার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আছে। তার নির্দেশ অমান্য করা প্রায় অসম্ভব। ভয়ে ভয়ে আবার বলেছিলাম,

'যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

'সুধা সিংহ বলেছিল, 'না, কক্ষণো না। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। কোনমতেই ওদের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না।'

'একরকম জোর করেই মেয়েটা আমাকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে কিছু বলতে হয় নি, যা-যা ঘটেছে সুধাই সব বলেছিল। শুধু সেদিনের কথাই না, প্রথমদিন থেকে মহেশপ্রসাদ যে সব কাণ্ড করে আসছে সমস্ত বলে গিয়েছিল। প্রিন্সিপ্যাল মহেশ-প্রসাদকে ডাকিয়ে খুব বকেছিলেন, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন। সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এরকম অসভ্যতা করলে কলেজ থেকে বার করে দেবেন।

'সে দিনগুলো আজকালকার মতন ছিল না। ছেলেরা মাস্টার-মশায়দের ভয়-টয় পেত, ভক্তি করত। মনে আছে, সেই থেকে মহেশ-প্রসাদ একেবারে মিইয়ে গিয়েছিল, আমার পেছনে আর লাগত না। আমাকে এ রাস্তায় দেখলে ও রাস্তায় পালিয়ে যেত।

'যাই হোক, সেই সামান্য ঘটনাটা আমার জীবনে নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। কিভাবে, সেটা ব্যাখ্যা করা দরকার। সুধা সিংহের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে সেই যে আলাপ হয়েছিল, সেখানেই তা থেমে থাকে নি।

'আগেই বলেছি, সুধাকে সেই প্রথম দেখলাম না। ভর্তি হবার পর থেকে দেখে আসছিলাম। একই ক্লাসে পড়তাম, দিনের মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাছাকাছি বসে কাটত। স্বাভাবিক নিয়মেই তার দিকে চোখ যেত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সে তাকানোর পেছনে কৌতূহল ছিল না, বিশ্লেষণ ছিল না। আমার মতন একটা মুখচোরা ছেলের পক্ষে একটি শহুরে রূপসী তরুণী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়া অভাবনীয় ঘটনা। সুধাও এগিয়ে এসে আলাপ-টালাপ করে নি, করবার তেমন কারণও ঘটে নি।

কিন্তু রূপ-লাবণ্যের দিকে সেদিন আমার লক্ষ্য ছিল না। সেদিন সুধা আমাকে যেদিক থেকে আকর্ষণ করেছিল তার নাম ব্যক্তিত্ব।

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক দঙ্গল ছেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন মেয়ে যে ওইরকম একটা কাণ্ড করতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। সুধার সাহস এবং ব্যক্তিত্ব সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তা ছাড়া আরেক দিক থেকেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। মহেশদাদাকে সুধা যেভাবে টিট করে দিয়েছে, তারপর সে আর আমার পেছনে লাগবে না।

'যাই হোক, আলাপটা যখন হয়েই গেল তখন উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। কিন্তু এগিয়ে যাবার সাহস নেই। সুধা কিন্তু আমার সাহস সঞ্চয়ের জন্য বসে থাকল না, নিজেই এগিয়ে এল অনেক, অনেক এগুলো। এতখানি এগুলো, যার ফলে আমার জীবনটাই একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেল।

বলতে বলতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন চতুরলাল মিশ্র। একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন :

'মনে আছে, টিকির ব্যাপারের দিন তিনেক পর কলেজে গেটের কাছে সুধার সঙ্গে দেখা। তখন বিকেল, কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। আগেই বলেছি, কলেজ-হোস্টেলে থাকতাম। হোস্টেল-বাড়িটা ছিল কলেজ থেকে খানিক দূরে, হেঁটে গেলে মিনিট দশেকের পথ। আমি সেখানেই ফিরছিলাম। সুধা ডেকেছিল 'এই যে চতুরলালজী'

'থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সুধা হেসে বলেছিল, 'কোথায় যাচ্ছেন ? হোস্টেলে ?'

'আমি সঙ্কোচে জড়সড়। অনাত্মীয়া কোন তরুণীর সঙ্গে এভাবে কথা বলার অভ্যাস আমার ছিল না। নিজের বোনেরা ছাড়া তার আগে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মিশিও না। কোনরকমে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।'

'সুধা বলেছিল, 'দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন, চলুন-'

'মেয়েটা আশ্চর্য সাবলীলা, অনায়াসগামিনী। সে কি আমার হোস্টেলে যেতে চায় নাকি ? সন্দিগ্ধ গলায় বলেছিলাম 'আপনি ?'

'সুধা বলেছিল, 'আমি ঐ রাস্তা ধরেই যাব। আপনাদের হোস্টেল

পেরিয়ে আর মিনিট পনেরো হাঁটলে আমাদের বাড়ি।'

'লাল সুরকি-ঢালা রাস্তাটা চমৎকার। কোথাও তার বাঁক-টাঁক খাঁজ-খোঁজ নেই ; সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। দু ধারে বড় বড় ঝাঁকড়া-মাথা রেন-ট্রী, পিপুল আর সিমুর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকেল বেলা গাছের লম্বা ছায়া এসে পড়েছিল রাস্তাটার ওপর। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে পাটনা শহরে কত লোকই বা ছিল। প্রায় নির্জন ছায়াচ্ছন্ন রাস্তায় আমরা হাঁটতে শুরু করেছিলাম।

যেতে যেতে সুধা আবার বলেছিল, 'আপনাদের বাড়ি তো পূর্ণিয়া জেলায় ?'

'আমি বিমূঢ়। বলেছিলাম, 'আপনি জানলেন কেমন করে ?'

'যেভাবেই হোক জেনেছি। এখন আমার কথার উত্তর দিয়ে যান।'

'বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি পূর্ণিয়া জেলাতেই।'

'সুধা বলেছিল, 'জনকপুর গ্রাম ?'

'মাথা নেড়েছিলাম, 'হ্যাঁ।'

'সুধা আবার বলেছিল, 'আপনি তো এ বছর ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন—'

'মেয়েটা কি হাত গুনতে জানে! জাদুকরীর মতন আমার সব খবর কেমন টপাটপ বলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'আপনি এসব জানলেন কেমন করে ?'

'হাসতে হাসতে সুধা বলেছিল, 'এর জন্যে কষ্ট করতে হয় নি। ফুল ফুটলে তার গন্ধ ঠিক নাকে আসে।'

'লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম, 'কি যা-তা বলেন!'

'যা—তা!'

'তা ছাড়া কী—'

'জানেন, আপনি ছাড়া আমাদের কলেজে স্কলারশিপ-পাওয়া আর কোন ছেলে নেই।'

'কথাটা ঠিক। কিন্তু এর উত্তর হয় না। আমি চুপ করে ছিলাম।

'আপনাকে নিয়ে আমাদের কলেজের খুব গর্ব। প্রফেসরস রুমে সেদিন একটা দরকারে গিয়েছিলাম। আমাদের ইংরেজির প্রফেসর মাধব সান্যাল তখন আপনার কথা খুব বলছিলেন কী বলছিলেন জানেন ?'

'আমি জানব কেমন করে ? আমি তো আর প্রফেসরস রুমে যাই নি।'

'প্রফেসর সান্যাল বলছিলেন, আপনার মতন ছাত্র আমাদের কলেজে অনেককাল আসে নি।'

'কথায় কথায় আমরা অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম।

'কলেজ-হোস্টেলের কাছাকাছি এসে সুধা বলেছিল, 'আমি আর কতক্ষণ ক্লাসে থাকি ! অন্য সময় সেই বাঁদর ছেলেটা আপনার পেছনে লাগে ?' 'সুধা যে মহেশপ্রসাদের কথা বলছে, বুঝতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, 'না, আর লাগে না। আপনি ওর যা অবস্থা করে দিয়েছেন !' 'সুধা বলেছিল, 'এক নম্বরের শয়তান ! এরকম বদমাস ছেলে আর হয় না। আবার কখনও যদি লাগে, আমাকে বলবেন। একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব। আপনার হোস্টেল তো এসে গেল, আচ্ছা আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে।'

'নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই হবে।'

'আমার গলায় কতখানি আগ্রহ ছিল, আজ আর মনে পড়ে না। এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সুধা বলেছিল, 'নমস্তে'

'নমস্তে।'

'সুধা চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমার প্রাণের ভেতর কোথায় যেন একটা বিচিত্র রেশ ঢেউয়ের মতন দুলতে শুরু করেছিল বিচিত্র ঘোরের মধ্যে এলোমেলো পায়ে হোস্টেল-বাড়িটায় গিয়ে ঢুকেছিলাম। নিজের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন চুপচাপ বসে ছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল

'এরপর থেকে রোজই আমাকে ডেকে গল্প-টল্প করত সুধা। ক্লাসে

অবশ্য নয়। ক্লাসের বাইরে—করিডরে, কলেজের মাঠে—আমাকে দেখতে পেলেই ছুটে আসত। তবে সব চাইতে বেশি দেখা হত ছুটির পর, কলেজ-গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত সুধা। আমি এলেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকত। হোস্টেল পর্যন্ত প্রতিদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তার যাওয়া চাই-ই। ব্যাপারটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

'ধীরে ধীরে আমারও সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছিল। কলেজ, প্রফেসরের লেকচার, নোট নেওয়া আর কালো কালো অক্ষর বসানো অসংখ্য বই—এসবের বাইরেও যে একটা মনোহর কুহকময় জগৎ আছে, তার খবর জানতাম না। সুধাই আমার কাছে সেই জগতের সুঘ্রাণ নিয়ে এসেছিল। সারা দিনে কতটুকু সময় আর তার সঙ্গ পেতাম! সেইটুকুর জন্যই সারাক্ষণ যেন উন্মুখ হয়ে থাকতাম। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে তার ধ্যানই করতাম। মেয়েটা আমার সমস্ত সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল একটা দিন ওর সঙ্গে দেখা না হলে কি খারাপ যে লাগত! সব চাইতে বিশ্রী লাগত ছুটির দিনগুলো। সেইসব দিন যেন আর কাটতে চাইত না।

'ব্যাপারটা একতরফা ছিল না। লক্ষ্য করেছি, আমার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য সুধাও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। আমার মতন দেহাতী একটি ছেলে—যার বেশবাসে পারিপাট্য নেই, চলায়-ফেরায় কথায়-বার্তায় দীপ্তি নেই, সব সময় যে শামুকের মতন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে—তার মধ্যে কি আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছিল সুধা বলতে পারব না। শুধু এটুকু অনুভব করতাম, আমার নানাদিকের অনেকগুলো বন্ধ দরজা খুলে গেছে। তার মধ্য দিয়ে উল্টোপাল্টা হাওয়া ঢুকে আমার মধ্যে যেন ওলট-পালট ঘটিয়ে দিচ্ছিল।

'প্রথম প্রথম লেখাপড়া নিয়েই আমাদের আলোচনা হত। কোন প্রফেসর ভাল পড়ান, কোন প্রফেসর খারাপ, কোন কোন প্রফেসর কোন স্থান—এই সব। মাঝে মাঝে আমার কাছে নোট চাইত সুধা, 'কথাট লাইব্রেরি থেকে কোন ভাল বই নিয়ে পড়বে তার কথা

লতাম ; সুধা পরের দিনই সেই বইটা নিয়ে যেত ধীরে ধীরে কবে
য আলোচনাটায় অন্য রঙ ধরেছিল, টের পাই নি। কবে যে আমরা
আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমেছি, তাই বা কে বলবে

'সুধা বলত, 'বাড়িতে তোমার কে কে আছে ?'

'আমি বলতাম। তারপর জিজ্ঞেস করতাম, 'তোমাদের কে কে
আছে, বল—'

'সুধা তাদের ফ্যামিলির কথা বলত। তার বাবা পাটনায় বড়
চাকুরে, মা নেই। ভাই-বোন মিলিয়ে তারা তিনজন। দুই ভাই আর
স। সুধাই সবার ছোট।

'একদিন সুধা বলেছিল, 'জানো, তোমার কথা আমার বাবাকে
লেছি।'

'আমি চমকে উঠেছিলাম 'কী বলেছ ?'

'কী বলতে পারি, তুমিই বল—'

'কেমন করে বলব, আমি কি হাত গুনতে জানি ?'

'এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নাক কুঁচকে কেমন করে
যন হেসে উঠেছিল সুধা, 'কী বলেছি জানো ? বলেছি তুমি খুব বিচ্ছিরি,
লেখাপড়ায় গবেট, সব সময় আমার পেছনে ঘুর-ঘুর করো আর
জ্বালিয়ে মারো--'

'ওসব যে বলে নি, সুধার চোখ মুখ দেখে এবং বলার ধরনে বুঝতে
পারছিলাম। বলেছিলাম, 'আমার সম্বন্ধে তো ভাল তোমার বাবার
চমৎকার একখানা ধারণা হয়েছে।'

'সুধা ঘাড় কাত করে দিয়েছিল, 'হু—'

'আমি বলেছিলাম, 'সব শুনে তোমার বাবা কী বললেন ?'

'তোমাকে আমাদের বাড়ি যেতে বলেছেন।'

'মিথ্যে কথা।'

'সত্যি বলছি। কবে যাব বল ?'

'না বাপু, আমি যেতে-টেতে পারব না।'

'যাবে না কেন ?'

'তোমার বাবা কি ভাববেন !'

'সুধা বলেছিল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আমার বাবাকে দ্যাখো নি, এমন ভাল মানুষ হয় না। সব চাইতে বড় কথা বাবা খুব মডার্ণ, কোন ব্যাপারেই তাঁর গোঁড়ামি নেই। আমাদের সঙ্গে উনি বন্ধুর মতন ব্যবহার করেন। তুমি গেলে কি রকম খুশী হন, দেখে--'

'আমার দ্বিধা তবু যায় নি। সুধা কিন্তু জোর করে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। সুধারা যে এত বড়লোক, আগে বুঝতে পারি নি। পাটনা শহরের মাঝ মধ্যিখানে ওদের প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনের দিকে প্রকাণ্ড বাগান, তার পরিচর্যার জন্য দু-তিনটে মালীই রয়েছে। একধারে সমান করে ছাটা সবুজ ঘাসের মাঠ, তার মাঝখান দিয়ে নুড়ি বসানো পথ। পথটার দু-ধারে ঝাউগাছ বসানো।

'বাড়িটা তিনতলা, তার গায়ে গথিক স্থাপত্যের ছাপ মারা। সামনের দিকে বড় বড় থাম। ইংরেজী সাহিত্যে ক্যাসেলের বর্ণনা পড়েছিলাম তার সঙ্গে বাড়িটার প্রচুর মিল। এমন বাড়ি কোনদিন চোখে পড়ে নি ; ভেতরে ঢোকা তো দূরের কথা।

'সুধাদের বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকেই তিনটে ফীটন আর গোটা দুই পুরনো আমলের ফোর্ড গাড়ি চোখে পড়েছিল। এতগুলো যানবাহন বাড়িতে মজুত, অথচ সুধা পায়ে হেঁটেই কলেজে যাওয়া-আসা করত এত বড় লোক হয়েও সুধার চালচলন কত সাদাসিধে, কত সাধারণ ওর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সেদিন দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

'যাই হোক, চারদিকে তাকিয়ে আমার মাথা যেন ঘুরে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল, এসব সত্যি না, স্বপ্নের ঘোরে এক অলীক অবাস্তব পৃথিবীতে পা দিয়ে ফেলেছি। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল 'তোমরা এত বড়লোক !'

'সুধা বলেছিল, 'ওসব ছাড় তো। এসো আমার সঙ্গে—'

'বাড়ির ভেতর আসতেই নানারকম ভারী ভারী দামী দামী আসবা

দেখতে পেয়েছিলাম। খাট, সোফা-সেটি, চেয়ার-টেবিল — সব কিছুই মেহগনি কাঠের, তাতে সুন্দর কারুকাজ মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তার ভেতর ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ বসানো। দেয়ালে দেয়ালে হরিণ-মুণ্ডু, নীল গাইয়ের মাথা এবং বাঘছাল ঝুলছে সুদৃশ্য কাচের আলমারির ভেতর দেশী-বিদেশী নানারকম সুদৃশ্য পুতুল। ঝাড়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এ্যাকুয়েরিয়ামে লাল-নীল মাছেদের খেলাও চোখে পড়েছিল।

'সুধার দাদারা কেউ বাড়ি ছিল না। বাবা অবশ্য ছিলেন। নামটা আগেই শুনেছিলাম। ডাক্তার বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহের চেহারা বিপুল, প্রায় ছ' ফুটের মতন লম্বা, প্রস্থ সেই অনুপাতে। মোমে-মাজা গোঁফের দুই প্রান্ত অতি সূক্ষ্ম। এমন বিশাল দেহ, কিন্তু এক কাচ্চা মেদ নেই। হাত-পা-বুক, সব জায়গাতেই থরে থরে সাজানো দৃঢ় সবল পেশী। দেখেই মূর্ছা যাবার কথা। আমি প্রায় ঘামতেই শুরু করেছিলাম। ঘামতে ঘামতে শরীরটা ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল: যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার মতন ভিখিরির এ বাড়িতে ঢোকার আস্পর্ধা কোত্থেকে হল, তখন কী উত্তর দেব? এমন বিপদে আগে আর কখনও পড়ি নি।

'সুধা আলাপ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহ বললেন, 'আও বেটা—' বলেই আমাকে বুকের ভেতর টেনে নিলেন। সেখানে বন্দী থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, বাইরেটাই যা ভীতিকর। নইলে এই প্রকাণ্ড বলবান মানুষটি স্নেহপ্রবণ, তাঁর মনটি তুলোর মতন কোমল।

'একসময় আমাকে বুকের থেকে বার করে বিন্ধ্যেশ্বরী বলেছিলেন, 'বোসো বেটা, বোসো—'

'আমি মুখোমুখি একটা সোফায় বসেছিলাম। বিন্ধ্যেশ্বরী আবার বলেছিলেন, 'তোমার কথা সুধার কাছে অনেকবার শুনেছি। শুনে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কতদিন বলেছি নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, আনে আর না। তা তুমি এত রোগা কেন?'

'আমি উত্তর দিই নি, ঘাড় নীচু করে বসে থেকেছি।

'বিন্ধ্যেশ্বরী আবার বলেছিলেন, 'শুধু লেখাপড়া করলেই হয় ন স্বাস্থ্য-টাস্থ্যর দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার, বুঝলে?'

'অস্ফুট গলায় বলেছিলাম, 'জী।'

বিন্ধ্যেশ্বরী বলেছিলেন, 'জী নয়। আগে কী বল?'

আমি প্রতিধ্বনি করেছিলাম, 'আগে স্বাস্থ্য।'

'কথাটা মনে থাকে যেন '

'জী থাকবে।'

বিন্ধ্যেশ্বরী বলেছিলেন, 'বেশ, ভাল কথা। শরীর-স্বাস্থ্য না থাকলে সবই গেল। তখন দেখবে, কেউ তোমার নয়। সে যাক গে, এখন কী খাবে বল—'

আমার ঘাড় আরো নুয়ে পড়েছিল, বলেছিলাম, 'জী –'

'জী কী হে—' বলেই বিন্ধ্যেশ্বরী গলা তুলে ডেকেছিলেন 'রামভুজ—রামভুজ—' ডাকামাত্র একটি চাকর জাতীয় লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বিন্ধ্যেশ্বরী তাকে বলেছিলেন, 'খাবার-টাবার কিছু নিয়ে আয়।'

'একটু পরে রামভুজ যা নিয়ে এসেছিল তা দেখে আমার চক্ষুস্থির বড় বড় শ্বেতপাথরের প্লেটে পাহাড়-প্রমাণ মিষ্টি, ফল আর রাবড়ি তা ছাড়া ছিল আখের শরবৎ। আমি আঁৎকে উঠেছিলাম, 'অত খেতে পারব না '

'বিন্ধ্যেশ্বরী চোখ পাকিয়ে গর্জন করেছিলেন, 'স্বাস্থ্য রাখতে হলে এটুকু খেতেই হবে। খাও—'

ভয়ে ভয়ে থালায় হাত দিয়েছিলাম। আমার দুরবস্থা দেখে সুধা ভারী খুশী, সে খুব হাসছিল।

'খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তাও চলছিল। প্রথমে লেখা পড়ার কথা, তারপর কোথায় থাকি, হোস্টেলে কী কী খেতে দ্যায়, এই সব আলোচনা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের সংসারের সব খবর

জেনে নিচ্ছিলেন বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহ। আমরা বড় গরীব, ভালভাবে সংসার চালাবার মতন সংস্থানটুকুও আমার বাবার নেই এসব শুনতে শুনতে তাঁর চোখে বার বার করুণ ছায়া পড়েছিল

'খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেলে বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহ বলেছিলেন, তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমাদের বাড়ি চলে আসবে, কেমন?'

'আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'জী।'

'প্রথম আলাপের সময় বিন্ধ্যেশ্বরী যখন বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিলেন তখন মনে হয়েছিল, মানুষটি স্নেহময়। ও-বাড়ি থেকে আসার সময় তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু ভেবেছিলাম—উদার, হৃদয়বান, সংস্কারমুক্ত এবং প্রচণ্ড বড়লোক হয়েও গরীবের ওপর সহানুভূতিশীল।

'বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহ সেই যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তা অমান্য করার শক্তি আমার ছিল না। তাঁর উদারতা, স্নেহপ্রবণতা, মধুর ব্যবহার এবং মনোহারিণী সুধা—সব মিলিয়ে ঐ বাড়িটা যেন জাদুকরের মতন নিয়ত হাতছানি দিয়ে যেত। রোজই ওখানে যেতে ইচ্ছা করত। মনে হত সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে, তিন বেলাই যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসি। কিন্তু পারতাম না, সঙ্কোচ আর কুণ্ঠা যেন লোহার বেড়ি হয়ে আমার পা আটকে রাখত

'সুধা অবশ্য কলেজ-ছুটির পর মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি নিয়ে যেত। সেই সব দিন হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে যেতাম তারপর ধীরে ধীরে কবে যে সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল, সাহস বেড়ে গিয়েছিল, কবে থেকে যে একা একা সুধাদের বাড়ি যেতে শুরু করেছিলাম, এবং এই যাওয়া-আসার ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল, এতকাল পর আর মনে নেই।

'সুধার সঙ্গে মিশি, তাদের বাড়ি যাই—একজন এসব পছন্দ করত না। সে হল মহেশপ্রসাদ। কিছু বলত না বটে, তবে রাহুর মত কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকত এই রাহুর দৃষ্টি আমার জীবন ছারখার করে দিয়েছিল। কিন্তু সে সব পরের কথা—অনেক, অনেক পরের।

সময়মতন সেটা বলা যাবে।

'ফার্স্ট' ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার—চারটে বছর যেন স্বপ্নের ভেতর কেটে গিয়েছিল। কেন না, চার বছর ধরে আমার সহপাঠিনী ছিল সুধা। পরস্পরকে জানবার পক্ষে, ঘনিষ্ঠ হবার পক্ষে এই বছরগুলো খুব অল্প সময় নয়। পরস্পরকে বোঝার পালা আমাদের শেষ হয়েছিল।

'এই চারটে বছর কি শুধু স্বপ্নই? পাটনায় এসে যখন থাকতাম তখন তা-ই।

'কিন্তু লম্বা ছুটিতে যখন পূর্ণিয়া জেলায় জনকপুর বলে একটা অখ্যাত দরিদ্র গ্রামে ফিরে যেতাম তখন আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। বাবার চেহারা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল, শিরদাঁড়া বেঁকে আরো কুঁজো হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। জিলজিলে বুকের ভেতর থেকে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে পড়েছিল। মাথার চুল একটাও আর কালো ছিল না। চারটে বছর নয়, যেন চার শো বছরের ক্লান্তি বাবাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। বাবা তবু হাঁটা-চলা করতে পারতেন। মায়ের সে শক্তিটুকুও ছিল না। আমি যখন থার্ড ইয়ারে তখনই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, দিন-রাত কাশতেন আর হাঁপাতেন। নিশ্বাস ফেলতে ভীষণ কষ্ট হত। বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। ভাই-বোনগুলোর দিকে আর তাকানো যেত না। তাদের অপুষ্ট রুগ্ন শরীরে বাড় যেন চিরকালের জন্য থমকে গিয়েছিল। তাকালেই বোঝা যেত, কোনদিন ওদের খাওয়া জোটে, কোনদিন বা উপোষ দিয়েই কাটিয়ে দ্যায়। আগেও ওরা সেলাই-করা তালি-মারা জামাকাপড় পরত, কিন্তু পোশাকগুলোর এমন হতচ্ছাড়া দশা আগে আর দেখি নি।

'জনকপুরে ফিরলে নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারতাম না। সংসারের সবাইকে মেরে নিজের এই বড় হওয়া নিদারুণ স্বার্থপরতা বলে মনে হত। মনে হত, বাবা-মা-ভাই-বোন, প্রতিটি মানুষকে

কসাইয়ের মতন হত্যা করছি। ওদের দিকে তাকিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে হত, কি হবে পড়াশোনা করে, আমি আর পাটনা ফিরে যাব না।

'বাবা কিভাবে আমার বড় হবার রসদ যুগিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে অসুবিধা হত না। আমি যেন উন্মাদ হয়ে যেতাম। বলতাম, 'আর পড়ব না, কিছুতেই না। আমার জন্য সবাই মরে যাবে, এ আর দেখতে পারছি না।'

'বাবার জ্যোতিহীন স্তিমিত চোখে হাসি ফুটত। বলতেন, 'আর তো ক'টা দিন। এতখানি এগিয়ে এসে পড়া ছাড়লে কখনও চলে! তুই ভাবিস না বাবা, আমি ঠিক চালিয়ে নেব। তারপর তুই পাস টাস করে বেরুলে আমার আর ভাবনা কী—'

'পাটনায় যখন ফিরতাম, জনকপুরের বাড়িটা দুঃস্বপ্নের মতন দিন কয়েক আমাকে যেন তাড়া করে ফিরত। মাত্র ক'টা দিন। তারপরেই সুধা সিংহ, তার উষ্ণ সহৃদয় সঙ্গ, বিন্ধ্যেশ্বরী সিংহের পিতৃর মতন ব্যবহার, তাঁদের ক্যাসেলের মতন বিশাল বাড়িখানা, সে বাড়ির সংস্কারমুক্ত উদার আবহাওয়া—সব একাকার হয়ে জনকপুরকে ধাক্কা মারতে মারতে বহু দূরে সরিয়ে দিত।

'ফিফথ্ ইয়ারের শেষে সুধা বলেছিল, 'অনেকদিন তো হল। এবার—'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এবার কী?'

'সুধা বলেছিল, 'আমাদের কিছু একটা সেটল্ করা দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'তুমি চিরকালের হাঁদারাম।'

'বুঝতে না পেরে আমি সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

সুধা বলেছিল, 'পাটনায় পাঁচ বছর কাটিয়েও গাঁইয়াই থেকে গেলে। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

'এবার আমার মাথায় কিছু কিছু ঢুকেছিল। চমকে উঠে

বলেছিলাম, 'তুমি কি বিয়ের কথা বলছ?'

'জী স্যার—'

পাঁচ বছরের মেলামেশা আর ঘনিষ্ঠতার পরিণাম যে এ-ই হওয়া স্বাভাবিক, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমি কিন্তু সে-কথা ভাবি নি। মনের সেই দিকটাতে এতকাল পিঠ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। সুধা যখন বিয়ের কথা তুলল, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছিল, আমরা গোঁড়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ আর সুধারা অন্য জাত। এ বিয়ে অসম্ভব। প্রাণ থাকতে মা-বাবা এ বিয়ে ঘটতে দেবেন না। এ কথা কানে গেলে বাবা-মা নির্ঘাত আত্মহত্যা করে বসবেন। ভয়ের গলায় বলেছিলাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'মনের কথা সোজাসুজি বলতে পারি নি। শিথিল সুরে বলেছিলাম. 'ভাবছিলাম—'

সুধা বলেছিল, 'কী?'

'আসল কথাটা গোপন করে বলেছিলাম, 'এখনই কী? এম. এ পরীক্ষাটা হয়ে যাক। একটা চাকরি-বাকরি করি, নিজের পায়ে দাঁড়াই। তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।' আমার ভয় হচ্ছিল আসল কথাটা বললে সুধাকে হারাব, এতদিনের স্বর্গ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

'সুধা বলেছিল, 'এম. এ. পরীক্ষার আর কিন্তু একটা বছর বাকি।'

'উত্তর দিই নি, অন্ততঃ একটা বছরও স্বপ্নটা আমার কাছেই থাক

'সুধা আবার বলেছিল, 'একটা কথা চিন্তা করেছ?'

'জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম, 'কী?'

সুধা বলেছিল, 'তোমরা-আমরা আলাদা জাত। আমাদের দিক থেকে বিয়েতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার বাবা-মা রাজি হবেন কি?'

'বুকের ভেতর দারুণ ধাক্কা লেগেছিল যেন। অত্যন্ত দুর্বল বো

করছিলাম। শিথিল স্বরে বলেছিলাম, 'বাবা-মাকে বলব।'

'কবে বলবে?'

'শিগ্‌গিরই।'

'শিগ্‌গিরই বলতে হবে না; এম. এ. পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর বোলো।'

'আচ্ছা।'

'ফিফথ্‌ ইয়ারটা তো কাটল। কিন্তু সিক্সথ্‌ ইয়ারে উঠবার পর আমার জীবনের ওপর ঝড় বয়ে গেল, সত্যিকারের ঝড়। এমন একটা ঘটনা ঘটল যা কোনদিন আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। লম্বা একুশটা বছর এই যে আমি জঙ্গলে একা একা নির্বাসিত হয়ে আছি, তার ইঙ্গিত ছিল সেই ঘটনাটির মধ্যে। মানুষের জীবন যে কি বিচিত্র! কত অঘটন যে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে!

'হঠাৎ বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এল আমার নামে, বাবার চিঠি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে যেতে লিখেছেন। পাঁচ বছর পাটনায় কাটিয়েছি, আগে কোনদিন এরকম চিঠি পাই নি। বাড়িতে যা-ই ঘটুক না, বাবা আমাকে জানান না। আমার মন যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়াশোনার ক্ষতি করে না বসি বাবার সেদিকে খুব নজর। তবে কি কিছু বিপদ-আপদ ঘটেছে? বুঝতে পারছিলাম না। পারছিলাম না বলে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মতন সেদিনই রওনা হলাম।

'বাবা যেন ট্রেনের সময় হিসেব-টিসেব করে আমার জন্যে বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন। উঠোনে পা দিতেই ছুটে এসে আমার হাত ধরলেন, 'এসেছিস বাবা, এসেছিস? আমি তো খুব চিন্তায় ছিলাম, এ সময় তুই আসতে পারবি কি না। তুই না এলে আমাকে আজ এখনই পাটনায় ছুটতে হত। সে যাক গে, আয়, ঘরে চল্‌—'

'উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী হয়েছে? অমন জরুরী চিঠি লিখলে?'

'বাবা বলেছিলেন, 'বলব। গাড়ির ঝাঁকুনিতে হয়রান হয়ে এলি। বিশ্রাম-টিশ্রাম কর, তারপর চান-টান করে খেয়ে নে। সন্ধ্যেবেলা সব শুনতে পাবি।'

'সমস্ত ব্যাপারটা বিচিত্র রহস্যময় মনে হচ্ছিল। আর কিছু না বলে বিশ্রাম করে স্নান-টান সেরে খেয়ে নিলাম। এসেছিলাম বিকেলবেলা, খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সময়টা ছিল পূর্ণিমাপক্ষ, সন্ধ্যেবেলাতেই রুপোর থালার মতন গোল একখানা চাঁদ উঠেছিল। জ্যোৎস্নায় চারদিক ধুয়ে যাচ্ছিল। দূরে আখ-খেতের দিক থেকে হাওয়া দিতে শুরু করেছিল। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া। বাবা আমাকে নিয়ে বারান্দায় বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ডেকেছিলেন, 'চতুর, তোকে না জানিয়ে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি।'

'উৎসুক চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কী কাজ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'আমি একজনকে একটা কথা দিয়ে ফেলেছি। এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। কত নিরুপায় হয়ে যে কথাটা দিতে হয়েছে তা শুধু আমিই জানি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী উপায় ছিল না? কাকে কথা দিয়েছ?'

'বাবা বলেছিলেন, 'নওলকিশোরজীকে।'

'কী কথা দিয়েছ?'

'আগে বল্ রাগ করবি না?'

'কী আশ্চর্য, রাগ করব কেন? নওলকিশোরজীকে কী বলেছ তাই বল না—'

'বলেছি—' বলেই থেমে গিয়েছিলেন বাবা। বারকয়েক ঢোঁক গিলে আবার আরম্ভ করেছিলেন, 'এই মাসেই তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

'আমাকে ঘিরে ভূকম্পনের মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেন শুরু হয়ে

গিয়েছিল। সামনের মাঠ, দূরের আখ-খেত, রুপোর থালার মতন গোল চাঁদ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না—সব, সব কিছু দুলে যাচ্ছিল। কী যেন বলতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু গলার ভেতর থেকে গোঙানির মতন একটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় নি। বার বার সুধার মুখটাই তখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

'বাবা এবার আমার হাত ধরে করুণ মিনতিপূর্ণ সুরে বলেছিলেন, 'আমার কথা তোকে রাখতেই হবে চতুর। নইলে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না।'

'আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমি যেন কিছুই শুনতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না। সাঁতার-না-জানা মানুষের মতন শুধু অথৈ পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছিলাম।

'বাবার কণ্ঠস্বর আবার আমার কানে বেজেছিল, 'তুই তো জানিস না, আমি কী করে বসেছি?'

আবছা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করেছ?'

'বাবা থেমে থেমে ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন, 'অনেক—অনেক ঋণ। প্রায় হাজার চারেক টাকার মতন। সুদে বেড়ে বেড়ে এখন সেটা ছ' হাজারে দাঁড়িয়েছে। আর—'

'আগের সুরেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আর কী?'

'বাবা বলেছিলেন, 'এই বাড়িটা চতুর্বেদীদের কাছে বাঁধা দিয়েছি। বছরখানেক আগেই টাকা-পয়সা মিটিয়ে ছাড়িয়ে নেবার কথা ছিল, পারি নি। আদালতে চতুর্বেদীরা মামলা করেছে। যে-কোন দিন আমরা উৎখাত হয়ে যেতে পারি।'

স্খলিত গলায় বলেছিলাম, 'কেন, কেন এসব করেছ?'

'বাবা বলেছিলেন, 'শুধু তোর, তোর জন্যে। নইলে আমার সাধ্য কি তোর পড়ার খরচ চালাতে পারি—'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কী যে বলব, কী বলা উচিত, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার পায়ের তলায় মাটি দুলছিল। মাথার

ভেতর আগুনের একখানা চাকা ঘুরে যাচ্ছিল।

'বাবা একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতন বলে যাচ্ছিলেন, 'আমি কী রোজগার করি, তা তো তুই জানিস। তার ওপর এতগুলো লোক। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—'

'খানিকটা সামলে নিয়ে বলেছিলাম, 'এসব করে কেন আমাকে পড়াতে গেলে? কেন—কেন—কেন?'

'নির্জীব করুণ গলায় বাবা বলেছিলেন, 'তোকে তো আগেই বলেছি বাবা, আমার খুব লোভ। ভেবেছিলাম তোকে বড় করতে পারলে আমি—আমরা সবাই সুখে থাকতে পারব। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'পারলাম না বাবা, পারলাম না।'

'গোঙানির মতন শব্দ করে বলেছিলাম, 'এ কি সর্বনাশ তুমি করলে বাবা! এ সব করবার আগে আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত!'

'বাবা এবার কিছু বলেন নি; শুধু করুণভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'যাই হোক বাবার মনোভাব বুঝতে পারছিলাম। আমার জন্য কারো মুখের দিকে তাকান নি: কেউ খেতে পেল কিনা, পরতে পেল কিনা, খোঁজ নেন নি। আমার জন্য সমস্ত সংসারকে তিল তিল করে তিনি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, আমার জন্য সব কিছু হাতের মুঠোয় পুরে বাজি ধরেছেন। কিন্তু—

'ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই বাবা বলে উঠেছিলেন, 'আমার সামনে কোথাও কোন পথ খোলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে নওলকিশোরজীর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করেছি। উনি বলেছেন, আমার সব ঋণ শোধ করে দেবেন। বাঁধা-দেওয়া বাড়ি ছাড়িয়ে আনবেন। আর—'

'কিছু না বলে আমি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'বাবা থামেন নি, 'আর তোর এম. এ. পড়ার সব খরচ উনি

চালাবেন। আর—'

'আর কী?'

'তুই যদি আরো পড়তে চাস, নওলকিশোরজী তাও পড়াবেন। এমন কি বিলাত যেতে চাইলেও পাঠাবেন।'

'আমি কিছুটা বিদ্রূপের সুরে বলেছিলাম, 'তাই নাকি?'

'বাবা আমার বলার ধরনটা লক্ষ করেন নি। উৎসাহের গলায় বলেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।'

'নওলকিশোরজীর বুঝি অনেক টাকা?'

'বহুত। খুদ পাটনা শহরেই সাত-আটটা বাড়ি; জমিজমা যে কত তার হিসেব নেই। তুই আর অমত করিস না বাবা—'

'এবার আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। এর পর সুধার কাছে আমি কেমন করে দাঁড়াব? বাবাকে বলতে ইচ্ছা করছিল, কেন, কেন তুমি এভাবে আমার সর্বনাশ করলে! আমি তো কলেজে পড়তে চাই নি। স্কুলের পালা চুকোবার পর চাকরিতে ঢুকতে চেয়েছিলাম। তুমিই আমাকে জোর করে পাটনায় পাঠিয়ে, বছরের পর বছর হোস্টেলের কড়ি গুনে গেছ। আমাকে পাটনায় না পাঠালে সুধার সঙ্গে আলাপ হত না, এই ক' বছরে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে সে একাকার হয়ে যেত না। এই সব বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। মনে হচ্ছিল আমার গলার কাছে ভারী পাথরের মতন কী যেন অনড় হয়ে আছে। ভেতরের কান্না বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি মরে যাব, নিশ্চয়ই মরে যাব। আমার চারপাশের সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

'বাবা আবার বলেছিলেন, 'তুই শিক্ষিত ছেলে। জানি তোর ওপর অবিচার করছি। নওলকিশোরজীকে কথা দেবার আগে তোর মতামত জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার সময় পাই নি চন্দুর। সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল।'

'আমি উত্তর দিই নি। মনে হচ্ছিল, আমার সমস্ত অস্তিত্ব অসাড়

অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। বাবার কথাগুলো, তাঁর নির্জীব কাতর কণ্ঠস্বর, সেখানে রেখাপাত করতে পারছিল না।

'বাবা বলেই যাচ্ছিলেন, 'কাল দুপুরে পাটনা থেকে নওলকিশোরজী আসবেন। স্টেশন থেকে সিধে আমাদের বাড়ি এসেই উঠবেন। তোর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে একেবারে আশীর্বাদ করে যাবেন। দুপুরের সময়টা তুই কোথাও যাস না।'

'এবারও আমি নিশ্চুপ। সেদিন রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলাম, পালিয়ে যাব। নওলকিশোরজী নামে এক অচেনা ভদ্রলোক আমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছেন। তিনি পৌঁছবার আগেই জনকপুর থেকে আমাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। পাটনারই আরেক কোণে সুধা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। না-না, নিজেকে এভাবে আমি ফুরিয়ে যেতে দিতে পারি না। মোটে তেইশ বছর বয়েস আমার। সুধা আমার জন্য জীবনকে রঙে রসে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। সেই স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হব, এ আমি ভাবতেই পারছিলাম না। সংসারের জন্য নিজেকে কিছুতেই মেরে ফেলতে পারব না।

'মনে পড়ে ঘুমোতে পারছিলাম না, চোখের পাতায় যেন হাজার কাঁটা বিঁধে যাচ্ছিল। আর বুকের অতল থেকে কেউ যেন বার বার ফিস ফিস করে বলে যাচ্ছিল, 'পালা, পালা। বাঁচতে চাস তো পালিয়ে যা। এখানে থাকলে নির্ঘাত মরে যাবি। এখনও সময় আছে, ভেগে পড়। নওলকিশোরজী এলে এই সংসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তুই আর পালাতে পারবি না। ঠিক ফাঁদের ভেতর আটকে যাবি।' কেউ যেন আমায় ধাক্কা মেরে তুলেও দিয়েছিল। রাত তখন ঝিম ঝিম করছে। আমাদের বাড়ি—আমাদের বাড়ি কেন, সারা জনকপুর গ্রামটা যেন নিশুতিপুর, ডাকিনীমন্ত্রে একেবারে নিঝুম হয়ে আছে।

'আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার ঘরে দু-তিনটে ভাই-বোন শুয়ে ছিল, তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। মা-বাবার ঘর ওধারে, সেটাও নিস্তব্ধ। চারদিক নিঝুম ; কেউ

কোথাও জেগে নেই। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না : কিছুইতে না। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সুযোগটা গলে গেলে আর তাকে পাব না।

'চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সময়টা ছিল জ্যোৎস্নাপক্ষ। চাঁদের আলোয় জনকপুর যেন ভেসে যাচ্ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে মাঠ, তারপর আখের খেত। বাড়ি থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে আখ-খেতে নামতে নামতে বুকের ভেতরকার সেই ফিসফিসানিটা ক্রমশঃ আরো প্রবল আরো শব্দময় হয়ে উঠেছিল, 'পালা, পালা, পালা—' সেই সঙ্গে আবার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে পেছনে টানতে শুরু করেছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে বাবার করুণ অসহায় মুখ, ভাই-বোনদের শীর্ণ ক্ষুধার্ত চেহারাগুলি আর সংসারের বিপন্ন ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠছিল। মনে পড়ছিল, আমাদের বাড়িটা চতুর্বেদীদের কাছে চড়া সুদে বাঁধা দেওয়া আছে। চতুর্বেদীরা টাকা না পেয়ে আদালতে মামলা করেছে। যে কোন দিন আমরা উৎখাত হয়ে যাব।

'চলতে চলতে কখন দাঁড়িয়ে পড়েছি, কখন পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করেছি, আর কখন বুকের ভেতরকার সেই ফিসফিসানিটা থেমে গেছে, খেয়াল নেই। পারব না, পারব না, হাজার বছর চেষ্টা করলেও আমি আর এখান থেকে বেরুতে পারব না, চিরকালের মতন আমি এখানে শৃঙ্খলিত হয়ে আছি। কোথায় যাব আমি? যেখানে ত দূরেই যেতে চাই না, আমাদের সংসার অদৃশ্য লম্বা হাত বাড়িয়ে ঘাড় ধরে ফিরিয়ে আনবেই।

'বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলাম, বারান্দায় বাবা বসে আছেন। আমাকে দেখে বলেছিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলি চতুর?'

'আমার জন্যেই কি বাবা রাত জেগে বসে ছিলেন। তাঁকে এভাবে বসে থাকতে দেখব, ভাবতে পারি নি।

'যাই হোক, উত্তর দেবার কিছুই ছিল না। গলার কাছটা কেউ যেন সবলে টিপে ধরেছিল। বানিয়ে-টানিয়ে যে একটা মিথ্যে বলব,

তেমন শক্তিও আমার ছিল না।

'বাবা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর উঠে এসে আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন। সস্নেহ কোমল স্বরে ডেকেছিলেন, 'চতুর—'

'চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়েছিলাম। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হচ্ছিল ঘাড় থেকে মাথাটা ভেঙে বুকের ওপর ঝুলে পড়ছে।

'বাবা বলেছিলেন, 'তুই চলেই যা।'

'আমি বলেছিলাম, 'না।'

'বাবা বলেছিলেন, 'রাগ বা দুঃখ করে বলছি না চতুর। আমার মন থেকে বলছি, চলে গেলেই তোর ভাল হবে। তুই বেঁচে যাবি। এই সংসারের জন্যে কেন তুই মরবি? কেন তোর জীবনটা নষ্ট হবে? চলে যা চতুর, চলে যা—'

'আর্তনাদের মতন একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল আমার গলা দিয়ে 'কোথায়—কোথায় যাব?'

'বাবা বলেছিলেন, 'পাটনায়, কিংবা যেখানে তোর খুশি। যা, চলে যা বাবা। চলে তো গিয়েই ছিলি, আবার কেন যে বোকার মতন ফিরে এলি!'

'কিন্তু—'

'বাবা হেসেছিলেন, 'তুই নওলকিশোরজীর কথা ভাবছিস?'

'বাবার দিকে না তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নেড়েছিলাম।

'বাবা বলেছিলেন, 'সে জন্যে তোর চিন্তা নেই। সে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে'খন। আমাদের জন্যে তোকে বেচে দেব, তা হয় না! কোন দিকে পথ দেখতে না পেয়ে নওলকিশোরজীকে কথা দিয়েছিলাম। রাত্রিবেলা ভেবে দেখলাম, অন্যায় করেছি ছেলে-বিক্রির টাকায় নিজের দেনা শোধ করব, বাড়ি ছাড়াব, তা হয় না।'

'এ বিয়ে যদি না হয়, নওলকিশোরজীর কাছে বাবাকে অপমানি

হতে হবে। তার চাইতে বড় কথা, খাতক আর মহাজনেরা শিকারী কুকুরের মতন বাবা-মা-ভাইবোনদের মাংস টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বে। আমি ছাড়া এ সংসারকে বাঁচাবার আর কেউ নেই।

'আমার জন্য এ সংসার অনেক দিয়েছে। সবাইকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি পাটনায় থেকে লেখাপড়া শিখেছি, সুধার সঙ্গে প্রেম করেছি। এই মুহূর্তে আমি যদি সরে যাই, তার চাইতে চরম নিষ্ঠুরতা আর কিছু নেই। এতখানি স্বার্থপর, এতখানি হৃদয়হীন আমি হতে পারব না। হঠাৎ আমার কী হয়ে গিয়েছিল! মেরুদণ্ডটা বেঁকে চুরে যাচ্ছিল; শরীরের সব হাড় গলে যেন নরম হয়ে যাচ্ছিল। পায়ে ভর দিয়ে আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি। বাবার পায়ের কাছে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কেঁদে উঠেছিলাম, 'আমাকে ক্ষমা করো বাবা, ক্ষমা করো।' সেই মুহূর্তে সুধা সিংহের মুখটা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

'পরের দিন দুপুরবেলা নওলকিশোরজী এলেন। টকটকে গায়ের রঙ, পোশাক-টোশাকের বাহার কত! বাবা আমাকে প্রণাম করতে বলেছিলেন, করে উঠতেই নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'তুমিই তো হলে চতুরলাল।'

'আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'তুমি এম. এ. পড়?'

'জী।'

'বেশ—'

'নওলকিশোরজী এবার বাবার দিকে তাকিয়েছিলেন, 'শর্মাজী—'

'বাবা তটস্থ হয়েই ছিলেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'জী—'

'নওলকিশোরজী আমাদের বাড়ির ওপর নজর ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে আমার পসন্দ হয়েছে। তবে বাড়ি-ঘরের যা নমুনা দেখছি তাতে আমার মেয়ে এসে থাকতে পারবে না। বুঝতেই তো পারছেন সে একটু অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। এখানে থাকতে হলে দু'দিনেই মরে যাবে।'

'বাবা বলেছিলেন, 'তা তো বটেই।'

'নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'আর মেয়ে যখন থাকবে না তখন জামাই কি করে সেখানে থাকে!'

'ও তো ঠিক কথা।'

'তাই ঠিক করেছি, পাটনায় মেয়েকে একখানা বাড়ি লিখে দেব। মেয়ে-জামাই সেখানে থাকবে। আপনি রাজী তো? ভাল করে ভেবে বলুন। পরে যেন আবার এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট না হয়। আমি সিধা আদমী; সিধা বাতই পসন্দ করি।'

'বাবা ঝাপসা চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার যা মর্জি—'

'নওলকিশোরজীর কোন কথায় বাবার আপত্তি নেই। আপত্তি করবার মতন মনের শক্তি তাঁর ছিল না। বুঝতে পারছিলাম, বাবা একটা ঘোরের মধ্যে নওলকিশোরজীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

'বাবার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে নওলকিশোরজী আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'চতুরলাল—'

'কথা বলবার ইচ্ছা-টিচ্ছা একেবারেই ছিল না। শূন্য চোখে এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। বেঁচে থাকার কোন অর্থই সেই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল না।

'নওলকিশোরজী বিবেচক, সন্দেহ নেই। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলবার আছে?'

'আস্তে মাথা নেড়েছিলাম, 'জী, না—'

'আমার মেয়েকে তুমি দেখবে?'

'দেখবার কিছুই ছিল না। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কালো-কুৎসিত কিংবা স্বর্গের পরী—যা-ই হোক না, নওলকিশোরজীর মেয়েকে বিয়ে করতেই হবে। এ-ই আমার নিয়তি। তা অস্বীকার করবার শক্তি আমার ছিল না। তেমন ইচ্ছাটুকুও আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল। রুদ্ধস্বরে

বলেছিলাম, 'জী, না—'

'নওলকিশোরজী আবার বলেছিলেন, 'পাটনায় গিয়ে দেখতে না চাও, আমি তার ফোটো এনেছি।'

'জানিয়েছিলাম ফোটো দেখবার বাসনাও আমার নেই

'নওলকিশোরজী ধরে নিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আমি বোধহয় লজ্জা পাচ্ছি। তাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট। রীতিমত প্রশংসার সুরে বলেছিলেন, 'শহরে গিয়েও যে বে-শরম হয়ে যাওনি, এটা খুব ভাল লাগল।'

'আমি চুপ।'

'নওলকিশোরজী এবার বাবাকে বলেছিলেন, 'কবে বিয়ের দিন ঠিক করতে চান?'

'বাবা বলেছিলেন, আপনি যেদিন বলবেন—'

একটু ভেবে নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'শুভকাজ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলাই ভাল। আসছে সপ্তাহে একটা দিন আছে।'

'পাটনা থেকে একেবারে তৈরি হয়েই এসেছিলেন নওলকিশোরজী। আমাকে হীরের আংটি, সোনার ঘড়ি আর জরির কাজ করা হলুদ রঙের পাগড়ী দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বাবার জন্যে এনেছিলেন লাল কাপড়ের থলে বোঝাই করে গোছা গোছা নোট। থলেটা বাবার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আট হাজার আছে। গুনে নিন।'

'বাবা বিমূঢ়ের মতন কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'অত দেবার তো কথা ছিল না; ছ' হাজার হলেই—'

'বাবাকে থামিয়ে দিয়ে নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'খুশি হয়ে দু'হাজার বেশি দিচ্ছি। ভাল শিক্ষিত জামাই পাচ্ছি। বড় আনন্দ হচ্ছে শর্মাজী, বাড়তি দু'হাজার টাকা কিছুই না।'

'পছন্দমত জিনিস পেলে মানুষ যে-কোন দাম দিতে কুণ্ঠিত হয় না, বরং খুশি হয়ে দামের ওপর দু-চার পয়সা বেশিই ছুঁড়ে দ্যায়। নওলকিশোরজীর মনোভাব অনেকটা সেইরকম। ছ' হাজারের ওপর বাড়তি হাজার টাকাটা ছিল তাঁর বকশিস। আর তা হাতে পেয়ে বাবা

একেবারে বিগলিত।

'পরের সপ্তাহে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। নওলকিশোরজীর মেয়ের নাম রজ্‌নী। চেহারার দিক থেকে বাপের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। গায়ের রঙ কালো, নাক-টাক বোঁচা, মুখের গড়ন সুশ্রী নয়--সব মিলিয়ে রজ্‌নী অতি সাধারণ। নওলকিশোরজীর মতন সুপুরুষ মানুষের যে এরকম মেয়ে থাকতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

'ভাল হোক মন্দ হোক, বিয়ের সময়টায় আমি বার দুই মাত্র রজ্‌নীর দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন করে ছিল সুধা। চারদিকের নিমন্ত্রিত লোকজন, বিয়ের অনুষ্ঠান—সব কিছুর ওপর সুধার মুখখানা যেন স্থির হয়ে ছিল।

'কথামত বিয়ের পর রজ্‌নীর নামে পাটনায় একখানা দোতলা বাড়ি লিখে দিয়েছিলেন নওলকিশোরজী। আমরা সেখানেই থাকতে শুরু করেছিলাম।

'বাড়িটা খুব বড় না, তবে চমৎকার। সামনের দিকে ফুলের বাগান পেছনে ঘাট-বাঁধানো পুকুর। শুধু বাড়িই স্থান নি নওলকিশোরজী চাকর-রাঁধুনী সবই দিয়েছিলেন। যতদিন না আমি রোজগার করছি ও বাড়ির যাবতীয় খরচের দায়িত্বও নিয়েছিলেন তিনি।

'বড়লোক শ্বশুর, সুন্দর বাড়ি, রজ্‌নী—কোনদিকে আমার লক্ষ ছিল না। বিয়ের পর আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে যেতাম না। সারাদিন বসে বসে শুধু ভাবতাম, এর পর সুধার কাছে গিয়ে কেমন করে দাঁড়াব।

'রজ্‌নী আমার অন্যমনস্কতা, অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল হয়তো বলেছিল, 'দিনরাত কী অত ভাব?'

'আমি চমকে উঠেছিলাম, 'কই কিছু না তো—'

'রজনী স্থিরচোখে আমাকে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই কিছু।'

'আমি উত্তর দিই নি।

একটু চুপ করে থেকে রজনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'আমি চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, 'কী?'

'রজনী বলেছিল, 'আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হও নি?'

'আমার বুকের ভেতর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। রজনীর চোখে আমি কি ধরা পড়ে গেছি? বলেছিলাম, 'হঠাৎ এ কথা বলছ!'

'রজনী বলেছিল, 'ওটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।'

'বুঝতে পেরেছিলাম, রজনী বিদুষী রূপসী না হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমতী। তার চোখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, একেবারে বুকের গভীর পর্যন্ত সে দেখতে পায়। যাই হোক, আমি উত্তর দিই নি।

'রজনী ধারালো গলায় বলেছিল, 'চুপ করে থাকলে চলবে না। বল—'

'রজনীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ আর রূঢ় শুনিয়েছিল। এই তো সেদিন বিয়ে হয়েছে, ভাল করে আমাদের পরিচয় পর্যন্ত হয় নি। প্রায়-অচেনা একটি পুরুষের সঙ্গে, হোক না সে স্বামী, এভাবে কেউ ধমকের গলায় কথা বলতে পারে, এ ছিল আমার পক্ষে অকল্পনীয়। স্তম্ভিতের মতন আমি তাকিয়ে ছিলাম।

'ভেংচি কাটার মতন করে রজনী আবার বলেছিল, 'আমি খুব কালো, না?'

'আমার নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। শিথিল গলায় বলেছিলাম, 'কী বলছ তুমি!'

'আগের সুরেই রজনী বলেছিল, 'ঠিকই বলছি। আমি খারাপ দেখতে, কুৎসিত—'

'রজনী কালো, দেখতে সুশ্রী নয়—এসব খুবই সত্যি। কিন্তু তা নিয়ে আমি কখনও ভাবতে বসি নি, মন খারাপ করতেও না। আমার ভাবনায় রজনী আদৌ রেখাপাত করতে পারে নি। আমার সমস্ত

সত্তাকে যে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে সুধা। বলেছিলাম, 'তুমি কালো, তুমি কুৎসিত—একথা আমি কখনও বলেছি?'

'রজ্‌নী বলেছিল, 'মুখে বল নি—'

'তবে?'

'মনে মনে সবসময় বলছ।'

'তুমি অন্তর্যামী নাকি! মনের কথা পড়তে পার?'

'রজ্‌নী তীব্র শ্লেষের সুরে বলেছিল, 'তোমার মনের কথা পড়বার জন্যে অন্তর্যামী হতে হয় না। সেটা তোমার মুখেও লেখা আছে। কিন্তু—'

'কিছু না বলে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'রজ্‌নী বলেছিল, 'একটা কথা মনে রেখ—'

'রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী?'

'পলকহীন স্থির চোখে আমাকে দেখতে দেখতে রজ্‌নী বলেছিল, 'আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ কিনা, সেটা বড় কথা নয়।'

'নিজের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'তা হলে কোন্‌টা বড় কথা?'

'রজ্‌নী বলেছিল, 'আমি সুখী হয়েছি কিনা—'

'আমি বিমূঢ়ের মতন তাকিয়েছিলাম। কী বলব, কী না বলব—কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না।

'রজ্‌নী থামে নি। আবার বলে উঠেছিল, 'বাবা আমার সুখের জন্যে তোমাকে আট হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনেছে—এই কথাটা কখনও তোমার ভুলে যাওয়া উচিত না।'

'রজ্‌নীর শেষ কথাগুলোতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। আট হাজার টাকার জন্য বাবা আমাকে এ কার কাছে বেচে দিয়েছেন! সে যা বলেছে তার ভেতর কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। বাকি জীবনটা তার পায়ে দাসখত্‌ লিখে কাটাতে হবে। তার সুখের জন্য মনোরঞ্জনের জন্য আমার বলতে সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে

'প্রথম প্রথম রজ্‌নীকে বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল। কিন্তু তার কথাবার্তা শোনবার পর ধারণা একেবারে বদলে গেল। সে অত্যন্ত দর্পিতা, রুচিহীনা এবং অহঙ্কারে-ঠাসা।

'শখের জন্য মানুষ কত কী কেনে, কত পয়সা ওড়ায়! রজ্‌নীর জন্য তেমনি আট হাজার টাকা দিয়ে নওলকিশোরজী আমাকে কিনে এনেছেন। এইরকম একটি অশিক্ষিতা অহঙ্কারী মেয়ের ক্রীতদাস হয়ে সমস্ত জীবন কাটাতে হবে, ভাবতে গিয়েই আমার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল।

'যাই হোক, বিয়ের পর আমি ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মাসখানেক লক্ষ করে রজ্‌নী বলেছিল, 'কি ব্যাপার, তুমি পড়া ছেড়ে দিলে নাকি?'

'আমি চমকে উঠেছিলাম, 'কই, না তো--'

'তবে কলেজে যাচ্ছ না যে?'

'কেমন করে রজ্‌নীকে বোঝাব, ইউনিভার্সিটিতে গেলেই সুধার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে! সুধার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার ছিল না। মুখ নীচু করে বলেছিলাম, 'বিয়ে-টিয়ে গেল — তাই —'

রজ্‌নী বলেছিল, 'বিয়ে তো কবে চুকে গেছে, এক মাস হয়ে গেল; এখনও তার ঘোর কাটল না!'

'আমি বলেছিলাম, 'কাল থেকে ক্লাস করতে যাব ভাবছি।'

'রজ্‌নী বলেছিল, 'হ্যাঁ, তাই যাবে। বড়লোক শ্বশুর পেয়ে পড়াশোনা ভুলে গেলে চলবে না। আমার কী শখ জানো?'

'ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী?'

'রজ্‌নী বলেছিল, 'আমার স্বামী এম. এ. পাস হবে। আমার খুড়তুতো-জেঠতুতো-মামাতো-পিসতুতো বোনেদের মধ্যে কারো বরই এম. এ. পাস নয়। তুমি পাস করলে সবাইকে নেমন্তন্ন করে আনব।'

'এম. এ. পাস স্বামী একটা মূল্যবান সম্পত্তি বৈকি। মানুষ যেমন করে লোক ডেকে ডেকে দামী শাড়ি দেখায়, গয়না দেখায়, তেমনি

করে আমাকেও দেখাবে রজ্‌নী। দেখাবে আর মনে মনে হয়তো বলবে, 'ছাখ ছাখ, আট হাজার টাকা দিয়ে বাবা আমার জন্য কেমন রঙচঙে পুতুল কিনে দিয়েছে। এমনটি তোদের নেই।' আমাকে প্রদর্শনীর মাঝখানে বসিয়ে নিজের সাধ মিটিয়ে নেবে রজ্‌নী।

'যাই হোক, পরের দিন রজ্‌নীর ভয়েই ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম চোরের মতন। বসেছিলাম মুখ নীচু করে সবার পেছনে। লক্ষ্য করেছিলাম, সামনের দিকে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চে অন্য সহপাঠিনীদের মধ্যে বসে আছে সুধা।

'প্রফেসর এসে রোল-কল শুরু করতেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। আমার রোল নম্বর ডাকতে যখন উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'প্রেজেন্ট স্যার—' সেইসময় নিজের অজান্তে আমার চোখ সুধার দিকে চলে গিয়েছিল। লক্ষ্য করেছিলাম, সুধাও একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

'ছাত্র হিসেবে আমি ভালই। বি. এ. অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। অধ্যাপকরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চিনতেন, স্নেহ করতেন। সে সব দিনে অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল মধুর, প্রীতিপূর্ণ। যিনি রোল-কল করছিলেন তাঁর নাম প্রফেসর সেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি ব্যাপার চতুরলাল, এক মাসের ওপর তুমি অ্যাবসেন্ট! শরীর-টরীর খারাপ হয়েছিল নাকি?'

'জড়ানো গলায় কিছু একটা বলে বসে পড়েছিলাম। প্রফেসর সেন আবার বলেছিলেন, 'এত ক্লাস কামাই করা উচিত না, ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল—'

'আমি উত্তর দিই নি।

'পর পর দুটো পিরিয়ড চলবার পর মাঝখানে একটানা চার পিরিয়ড বাদ। তারপর লাস্ট পিরিয়ড হয়ে ছুটি। প্রথম দু পিরিয়ড হবার পর একে একে সব ছেলে-মেয়ে বেরিয়ে গেলে ক্লাস যখন ফাঁকা হয়ে এল সেই সময় চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম। সবার চোখ এড়িয়ে

এড়িয়ে একরকম মুখ ঢেকেই সামনের মাঠে গিয়ে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পাকুড় গাছের আড়ালে বসেছিলাম। ইচ্ছা, চারটে পিরিয়ড এখানে কাটিয়ে লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাসে যাব সুধার সঙ্গে কতদিন এ রকম লুকোচুরি সম্ভব, ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

'কতক্ষণ বসে ছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডেকে উঠেছিল, 'চতুরলাল—'

'চমকে ঘুরে গিয়েছিলাম। আমার ঠিক পেছনেই সুধা। নিমেষে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। আয়না থাকলে দেখতে পেতাম, পরতে পরতে রক্ত নেমে গিয়ে আমার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

'পাশে বসতে বসতে সুধা বলেছিল, 'ভূত দেখলে মনে হচ্ছে। আমাকে চিনতে পারছ না!'

'কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। কেউ যেন সবলে কঠিন মুঠিতে আমার গলা চেপে ধরেছিল।

'সুধা বলেছিল, 'সেই যে বাড়ি গেলে তারপর আর পাত্তাই নেই। আমি এদিকে ভেবে মরি। বাড়ির খবর সব ভাল তো?'

'মাথা নীচু করে খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ।'

'সুধা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেশ থেকে কবে ফিরলে?'

'হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কোনরকমে জড়ানো জড়ানো গলায় বলেছিলাম, 'এই তো দু-চার দিন—'

'মুখখানা গম্ভীর করে সুধা এবার বলেছিল, 'বা রে, বেশ ছেলে তো তুমি! দু-চার দিন আগে ফিরেছ অথচ আমার সঙ্গে দেখা কর নি! এর মানে কী?'

'কী কৈফিয়ৎ দেব, ঠিক করে উঠতে পারি নি। আবছা গলায় বলেছিলাম, 'ভেবেছিলাম, শিগগিরই দেখা করব।'

'জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়েছিল সুধা, 'না—'

'নীচের দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী?'

'সুধা বলেছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে না।'

'কে বললে?'

'কে আবার বলবে, আমি বলছি। ক্লাসে চোখাচোখি হবার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর চোরের মতন এখানে এসে বসে আছ। তুমি আমাকে এড়াতে চাইছ। কিন্তু কেন? কেন? কেন?'

'আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে এড়াতে চাই নি। কিন্তু বৃথা— বৃথা—বৃথাই। আমার কোন কথাই শোনে নি সুধা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলেছিল, 'এবার কি তুমি বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ?'

'কিসের প্রতিজ্ঞা?'

'আমার মুখের দিকে তাকাবে না।'

'আমি হাসতে চেষ্টা করেছিলাম, 'কি আশ্চর্য, এইরকম একটা উদ্ভট প্রতিজ্ঞা করব কেন?' বলে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিতে হয়েছিল। তাকিয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। বার বার মনে হচ্ছিল, আমার মুখটা কালি দিয়ে মাখা। এ মুখ নিয়ে সুধার দিকে তাকানো উচিত না।

'সুধা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'হিয়ার ইউ আর! তুমি এখানে! আর সারা ইউনিভার্সিটি আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'সুধা এবং আমি, দুজনেই ফিরে তাকিয়েছিলাম। পাকুড়গাছের ওধারে মহেশপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে।

'মহেশপ্রসাদের কথা মাঝখানে বলতে ভুলে গেছি। ইন্টারমিডিয়েট, বি. এ.-তে, এমন কি ইউনিভার্সিটিতেও সে ছিল আমাদের সহপাঠী। আমাদের তিনজনেরই বিষয় এক—দর্শন। ইন্টারমিডিয়েটে আমার টিকির ব্যাপার নিয়ে সুধা তাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। সেই থেকে আমার পেছনে লাগত না সে, তবে সুযোগ পেলেই অকারণে টিটকিরি দিত, বিদ্রূপ করত। সুধার সঙ্গে আমার যে ধীরে ধীরে

ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে, তা টের পেয়ে জ্বলে যাচ্ছিল সে। বি. এ পড়বার সময় আমাদের নামে যা-তা লিখে সুধার বাবা আর প্রিন্সিপ্যালের কাছে চিঠি দিয়েছিল সে। সুধার বাবা গ্রাহ্য করেন নি। প্রিন্সিপ্যাল আমাদের ডাকিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, চিঠির কথাগুলো কতদূর সত্যি? আমি কিছু বলি নি। সুধাই যা বলবার বলেছিল। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, আমাদের দুজনের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক। পরস্পরের সত্যিকার বন্ধু আমরা, শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের ভেতর কোনরকম নোংরামি নেই। সুধার স্বীকারোক্তির মধ্যে এমন এক অকপটতা ছিল যা প্রিন্সিপ্যাল বিশ্বাস করেছিলেন। এরপর মহেশপ্রসাদ আর কিছু করে নি। তবে তার সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল, ভয় ছিল। তার চাউনি দেখে বুঝতে পারতাম, সুধা আর আমার মেলামেশা, আমাদের অন্তরঙ্গতা মহেশপ্রসাদের পছন্দ নয়। টের পাচ্ছিলাম, আড়ালে গুপ্তঘাতকের মতন সে ছুরি শানিয়ে চলেছে। কখন কোন্‌দিক থেকে সে আঘাত হানবে, সেটাই শুধু বুঝতে পারি নি।

'যাই হোক, সেই মুহূর্তে পাকুড়গাছের কাছে মহেশপ্রসাদকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছিল।

'আমি কিছু বলবার আগেই সুধার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'এখানে আপনার কী দরকার?'

'মহেশপ্রসাদ ঘাড় হেলিয়ে সুর টেনে টেনে বলেছিল, 'বিশেষ দরকার। তবে আপনার সঙ্গে নয়, চতুরলালের সঙ্গে—'

'সুধা বলেছিল, 'দয়া করে দরকারী কথাটা চটপট সেরে ফেলুন—'

'মহেশপ্রসাদের দু কান কাটা, লজ্জা-টজ্জার বালাই নেই। বলেছিল, 'আপনাদের রসালাপে যে বাধা হচ্ছে, বুঝতে পারছি। তবে বেশিক্ষণ নয় পাঁচ মিনিট, ওনলি ফাইভ মিনিটস আমি নেব।'

'সুধা রুক্ষ কর্কশ গলায় বলেছিল, 'পাঁচ মিনিট নয়, এক মিনিট। এর মধ্যে যদি কথা সারতে পারেন ভাল। নইলে দয়া করে আমাদের

মুক্তি দিন। আপনার সঙ্গে বক বক করতে খুব খারাপ লাগছে।'

'সুধা তাকে পরিষ্কার বিদায় নিতে বলেছিল। আত্মসম্মানবোধ যার আছে, এরপর সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু মহেশপ্রসাদ একেবারে অন্য ধাতুতে তৈরি। দাঁত বার করে সে বলেছিল, 'বেশ, এক মিনিটই নিচ্ছি।' বলেই আমার দিকে ফিরেছিল, 'কন্‌গ্র্যাচুলেসন্‌স্ ভাই, কন্‌গ্র্যাচুলেসন্‌স—'

'আমি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম, কোন উত্তর দিতে পারি নি। মহেশপ্রসাদকে দেখার পর থেকে বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছিল, এবার সেটা অসহ্য হয়ে উঠল।

'সুধা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিসের কন্‌গ্র্যাচুলেসন্?'

'মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'সে কি, আপনি কিছু জানেন না!'

'সুধা বিরক্ত হচ্ছিল ঠিকই, তবে কৌতূহলী না হয়েও পারে নি। বলেছিল, 'কী জানি না আমি?'

'মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'এবার দেশে গিয়ে চতুরলাল কী দারুণ কাণ্ড করে এসেছে, আপনাকে বলে নি?'

'সুধা এবার ধমকে উঠেছিল, 'বাজে না বকে আসল কথাটা বলুন—'

'মহেশপ্রসাদ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবার বলেছিল, 'জীবনের সব চাইতে বড় কাজটা সেরে ফেলেছে চতুরলাল, ও বিয়ে করেছে।'

'সাপের কামড় খাওয়ার মতন চমকে উঠেছিল সুধা, 'বিয়ে!'

'মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে মহেশপ্রসাদ বলেছিল, 'জী। কিন্তু—'

'অস্থির গলায় সুধা বলেছিল, 'কী?'

'মহেশপ্রসাদ এবার তার গোপন শানানো ছুরিখানা বার করে হৃৎপিণ্ডে বসাতে শুরু করেছিল, 'আপনি চতুরলালের বিয়ের কথা জানেন না?'

'সুধা মাথা নেড়েছিল, 'না।'

'মহেশপ্রসাদ চুক চুক করে জিভের ডগায় অদ্ভুত শব্দ করেছিল,

'বড় তাজ্জবের কথা! আপনি চতুরলালের বন্ধু—যেমন তেমন নয়, একে-বারে প্রাণের বন্ধু। অথচ আপনাকেই কিছু জানায় নি চতুরলাল। খুবই আপসোসের ব্যাপার।'

'একটু থেমে বলেছিল, 'আমার তো ধারণা ছিল, ওর বিয়েতে গিয়ে আপনি খুব আনন্দ করে এসেছেন।'

'সুধা উত্তর দ্যায় নি। বিমূঢ়ের মতন একবার আমার দিকে, একবার মহেশপ্রসাদের দিকে তাকাচ্ছিল সে।

'মহেশপ্রসাদ এবার আমাকে বলেছিল, 'ভেরি ব্যাড চতুরলাল, ভেরি ব্যাড। লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়েটা সেরে ফেললে, আর আমরাই জানতে পারলাম না। ছ' বছর ধরে একসঙ্গে এক ক্লাসে পড়ছি, নেমন্তন্নের লিস্ট্ থেকে আমাদের বাদ দেওয়াটা ঠিক হয় নি। আমাদের যদিও বা বাদ দিয়েছ, সুধা দেবীকে—'

'মহেশপ্রসাদের কথা শেষ হবার আগেই সুধা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দয়া করে চুপ করুন, চুপ করুন। আর কিছু শুনতে চাই না, এখন আপনি যান—'

'এতক্ষণে সময় সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়ে উঠেছিল মহেশপ্রসাদ, 'এক মিনিটের জায়গায় আপনাদের অনেকক্ষণ বিরক্ত করে গেলাম। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আচ্ছা চলি-'

'মহেশপ্রসাদ চলে যাবার পর দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজে দিয়েছিল সুধা। আমি কী করব, কী বলব—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। টের পাচ্ছিলাম গলার ভেতরটা শুকিয়ে একরাশ ধারালো বালির মত খরখরে হয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। একবার ভেবেছিলাম, ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু উঠতেই পারি নি, কেউ যেন অদৃশ্য পেরেক ঠুকে আমার পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

'কতক্ষণ নিঃশব্দে দুটো অসাড় শবের মতন আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, মনে নেই। হয়তো এক ঘন্টা, দু ঘন্টা। নাকি এক যুগ

কিংবা গোটা একটা শতাব্দীই ?

'অনেক—অনেকটা সময় পর গাছপালার ছায়া যখন দীর্ঘ হতে লাগল, সূর্যটা যখন পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে অনেকখানি নেমে গেল—তখন, সেইসময় হাঁটুর ভেতর থেকে সুধা বলেছিল, 'মহেশপ্রসাদ যা বলে গেল তা কি সত্যি ?'

'রুদ্ধস্বরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ—'

'সুধা মুখ তোলে নি। সেইভাবেই বলেছিল, 'এই জন্যেই কি বাড়ি গিয়েছিলে ?'

'কৈফিয়তের সুরে বলেছিলাম, 'বাড়ি যখন যাই তখন বিয়ের ব্যাপার কিছুই জানতাম না। ওখানে গিয়ে শুনলাম।'

'সুধা বলেছিল, 'মিথ্যে কথা। তুমি সব জানতে—'

'শিথিল গলায় বলেছিলাম, 'আমি মিথ্যে বলি না। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, কিছুই জানতাম না।'

সুধা এবার মুখ তুলেছিল। তার চোখ আরক্ত, জলপূর্ণ, ফোলা ফোলা। বলেছিল, 'হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটল যাতে বিয়ে না করে পারলে না ?'

'কারণটা বলেছিলাম।'

'তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের গলায় সুধা চিৎকার করে উঠেছিল, 'টাকা—সামান্য ক'টা টাকার জন্যে বিয়ে করতে বসে গেলে !'

'মুখ নীচু করে ম্লান গলায় বলেছিলাম, 'তোমাকে তো বললাম, এ ছাড়া আমাদের সংসার আর আমার বাবাকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না।'

'টাকার খুব দরকার ছিল তোমার, তাই না ?'

'হ্যাঁ—'

'আমাকে জানাও নি কেন ?'

'আমি চুপ।

'গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে সুধা চিৎকার করেছিল, 'মুখ বুজে

থাকলে চলবে না। বল—বল—'

'ফিস ফিস করে এবার বলেছিলাম, 'টাকা যে চাইব, একটা সম্পর্ক তো থাকা চাই—'

'সুধা বলেছিল, 'আমার সঙ্গে তোমার বুঝি কোন সম্পর্ক নেই? এই ছ'বছর ধরে আমাদের এই মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা এ সব তাহলে কী?'

'সুধার কথা আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। বলেছিলাম, 'তা ছাড়া কারো কাছে টাকা চাইতে—' এ পর্যন্ত বলে চুপ করে গিয়েছিলাম।

'আমার মনের কথা বুঝি বা পড়তে পেরেছিল সুধা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'টাকা চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল, এই তো? অতই যদি পৌরুষের অহঙ্কার, আট হাজার টাকায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বিয়ে করতে বসেছিলে কেমন করে? আত্মসম্মানবোধটা তখন কোথায় ছিল? ছি--ছি—'

'ধিক্কারে—বিদ্রূপে আমাকে একেবারে জর্জ্জরিত করে দিয়েছিল সুধা। ক্ষতবিক্ষত আমি, উদ্‌ভ্রান্ত আমি—মলিন মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। স্বপক্ষে বলবার মত আর কোন কৈফিয়তই আমার ছিল না।

'সুধা কিন্তু থামে নি। উন্মাদের মতন সমানে আঘাত হেনে যাচ্ছিল, 'তুমি প্রতারক, শঠ, কাপুরুষ, ভীরু --'

'সুধার সব আঘাত মুখ বুজে মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

'বলতে বলতে সুধা উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ।' বলে আর দাঁড়ায় নি, চলে গিয়েছিল।

'তারপরও কতক্ষণ বসে ছিলাম, খেয়াল নেই। মনে হচ্ছিল আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে, শ্বাসক্রিয়া চলছে না, আমি যেন নিশ্চেতন জড়স্তূপে পরিণত হয়েছি। হঠাৎ এক সময় পুলিস-ফাঁড়ির পেটা-ঘড়ির শব্দে চমকে উঠেছিলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যে নেমে গেছে, গাঢ় অন্ধকারে

চারদিক ঢাকা। ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ড একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকরা কখন চলে গেছেন, কে জানে। আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর টলতে টলতে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, আমি একেবারে শূন্য হয়ে গেছি। জীবনের স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

'এরপর দিনকতক কাটল। চোরের মতন ইউনিভার্সিটিতে যাই, লাস্ট বেঞ্চে বসে ফাঁকা দৃষ্টিতে অধ্যাপকদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাঁরা যা বলেন, একটি অক্ষরও মাথায় ঢোকে না। লক্ষ করেছি, সুধা আমার দিকে ফিরেও তাকাত না।

'মাসখানেক চলবার পর ক্লাস করে একদিন বাড়ি ফিরছি সুধা আমাকে ধরল। সেই পাকুড় গাছটার তলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'এত সহজে তোমাকে ছাড়ব না—'

'ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কী করতে চাও তুমি?'

'সুধা বলেছিল, 'তার আগে জবাব দাও, আমার এতবড় ক্ষতি কেন করলে? আমি কী অন্যায় করেছিলাম?'

'আমি তো তোমাকে সবই বলেছি।'

'একটুখানি নাকে কেঁদে কী বলেছিলে, মনে করেছ, তাতেই আমি গলে গেছি! তাতেই আমার সব ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে! না—না—না—'

'ব্যাকুল স্বরে বলেছিলাম, 'আমাকে ক্ষমা কর সুধা, ক্ষমা কর।'

'সুধা জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়েছিল, 'একটা মেয়ের চরম সর্বনাশ করে তার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা করে না! ক্ষমা তোমাকে করব না। আই হেট ইউ, আই হেট ইউ—'

'বলেছিলাম, 'আমাকে ঘৃণা করার অধিকার তোমার আছে। প্রাণভরে ঘৃণা কর আর অভিশাপ দাও—'

'সুধা বলেছিল, 'তাই দেব।'

'তারপর থেকে প্রতিদিন ক্লাস-ছুটির পর পাকুড়গাছের তলায় আমাকে নিয়ে গিয়ে ঐ একই কথা বলত সুধা, 'আই হেট ইউ—'

'আমি নিঃশব্দে তার দেওয়া সব আঘাত মাথা পেতে নিতাম।

'এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর একদিন সুধাকে বলেছিলাম, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'সুধা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী?'

'কাঁপা গলায় বলেছিলাম, 'তুমি একটা বিয়ে কর।'

'সুধা হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিল, 'চমৎকার, চমৎকার। সত্যিই তুমি মহানুভব। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো চতুরলাল—'

'রুদ্ধস্বরে বলেছিলাম, 'কী কথা?'

'সুধা বলেছিল, 'বিয়ে একটা ইচ্ছে করলেই করতে পারি, বাবা ছেলে-টেলে দেখছেনও। কিন্তু বিয়ে করলেই তুমি হাতের বাইরে চলে যাবে। সেটি হবে না। মুক্তি তোমাকে আমি দেব না। প্রতিদিন রাহুর মতন তোমার পেছনে লেগে থেকে বুঝিয়ে ছাড়ব, আমার কত বড় ক্ষতি তুমি করেছ।'

'এ তো গেল সুধার কথা। বাড়িতে রজনীকে নিয়ে আমার দাম্পত্য জীবন কেমন চলছিল, এবার সেটা বলা যাক। রজনী যে বড়লোকের মেয়ে, তার বাবা যে আট হাজার টাকা দিয়ে আমাকে কিনে এনেছেন, এই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে প্রতি মুহূর্তে আমাকে তা বুঝিয়ে ছাড়ত রজনী। আমার ব্যক্তিত্ব, আমার আত্মসম্মানবোধ সর্বক্ষণ তার পায়ের তলায় দলিত হচ্ছিল, পীড়িত হচ্ছিল।

'রজনীর স্বভাবের আর একটা দিক ছিল, আমার পক্ষে যা নিদারুণ। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মতন আমার সব কিছু সে আত্মসাৎ করে নিতে চাইছিল। গৃহপালিত পরাধীন পশুর মতন আমি তার কথায় উঠব-বসব, চলব-ফিরব—এই ছিল রজনীর ইচ্ছে। ফলে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল।

'সুধার জন্যে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে প্রতিদিন দেরি হয়ে যাচ্ছিল। কয়েক দিন লক্ষ করে একদিন রজনী বলল, 'রোজ রোজ এত রাত করে বাড়ি ফের যে? এতক্ষণ থাকো কোথায়?'

'আমি চমকে উঠেছিলাম, সুধার ব্যাপারটা রজনী কি টের পেয়েছে! সংশয়ের চোখে তার দিকে তাকাতে তাকাতে বলেছিলাম, 'ক্লাস ছিল, তাই---'

রজনী বলেছিল, 'আমাকে তুমি বোকা ভাব নাকি!'

'আমি হতবাক, 'হঠাৎ এ কথা?'

'রজনী আবার বলেছিল, 'কোথায় রাত পর্যন্ত পড়ানো হয়? নিশ্চয়ই ছুঁড়িদের সঙ্গে আড্ডা-টাড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে যায়।'

'কথাটা একেবারে মিথ্যে বলে নি রজনী। কিন্তু সে তো জানে না, সুধার সঙ্গে বসে কি আড্ডা দিই! বাড়িতে রজনী, ইউনিভার্সিটিতে সুধা—এই দুয়ের মাঝখানে নিয়ত আমি দগ্ধ হচ্ছিলাম। এরই মধ্যে এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। পাস করলাম। রেজাল্ট ভাল হয়েছিল, কলেজে অধ্যাপনার চাকরি জুটে গেল। আশ্চর্য, সুধাও ঐ একই কলেজে চাকরি নিয়ে এল। মহেশপ্রসাদও পাস করেছিল, সে চাকরি পেল কাছাকাছি একটা কলেজে। সপ্তাহে একদিন অন্তত আমাদের কলেজে সে হানা দিত। অশুভ গ্রহের মতন সে আমার পেছনে লেগে ছিল।

'ওদিকে সুধা আমাকে মুক্তি দিচ্ছিল না। সময় পেলেই সে আমাকে নিয়ে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসত। আর আমি যে তার কত বড় ক্ষতি করেছি, সেই কথাটা বার বার মনে করিয়ে দিত। একদিন সে আমাকে বলেছিল, 'তোমার কতদিন বিয়ে হয়েছে চতুর?'

'প্রশ্নটার উদ্দেশ্য কী, বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, 'প্রায় একবছর। কেন?'

'সুধা বলেছিল, 'এক বছর ধরে ভেবে দেখলাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।'

চকিত হয়ে উঠেছিলাম, 'কী বলছ তুমি!'

'সুধা ঘোরের মধ্যে থেকে যেন বলে যাচ্ছিল, 'ঠিকই বলছি। প্রাণপণে তোমাকে ভুলতে চেয়েছি, ঘৃণা করতে চেয়েছি, নিজেকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারি নি, পারি নি।'

'অসহায়ের মতন বলেছিলাম, 'কিন্তু আমি যে বিবাহিত সুধা—'

'সুধা উন্মাদের মতন মাথা নেড়েছিল, 'ও-বিয়ে আমি মানি না, মানি না। ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, তোমার আর আমার জীবনে সব চাইতে বড় দুর্ঘটনা—'

'বলেছিলাম, 'সত্যিই দুর্ঘটনা। কিন্তু তাকে অস্বীকার করব কি করে?'

'সুধা বলেছিল, 'যা সত্যি নয়, যা ঠিক নয়, তাকে অস্বীকার করতেই হবে।'

'এ বিয়ে আমার পক্ষে আনন্দময় হয় নি, নিরানন্দ অশুভ একটা অনুষ্ঠানকে স্বীকার না করা উচিত। তবু আকুল হয়ে বলেছিলাম, 'তুমি যদি এমন কর, আমি দুর্বল হয়ে পড়ব সুধা।'

'সুধা বলেছিল, 'আমি তো তোমাকে দুর্বল করতেই চাই। চলে এসো তুমি ওখান থেকে, চলে এসো।' রজনীর কথা কিছু কিছু জানত সুধা। সে বলে যাচ্ছিল, 'একটা কুৎসিত অশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কেমন করে তোমার কাটবে?' তখন থেকে রোজ এই কথাটাই বলে যাচ্ছিল সে।

'সুধা যা বলেছে তার ভেতর একছিটে মিথ্যে নেই। একটা অহঙ্কারী রুচিহীনা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটাবার কথা ভাবতে একেক সময় অস্থির হয়ে পড়তাম। তবু আমার ভেতর একটা ভীরু মানুষ আছে যে সংস্কারকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। যত অনিচ্ছাই থাক, দশজন সাক্ষী রেখে রজনীকে গ্রহণ করেছি। একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল যেন তার সঙ্গে আমার জীবনকে চিরদিনের মতন বেঁধে দিয়েছিল,

সেটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে সুধা আমার অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিতে শুরু করেছিল।

'দুই বিপরীত স্রোত যখন আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে সেই সময় একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেল।

'আগেই বলেছি, ইউনিভার্সিটি থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরা নিয়ে রজনী রাগারাগি করত, গালাগাল দিত। কিন্তু তার বেঁধে দেওয়া সময়ের ভেতর আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব হত না। সুধা আমাকে ছাড়লে তো ফিরব! কলেজে চাকরি নেবার পরও সেই একই নিয়ম চলছিল। রজনী প্রতিদিন এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধাত, আমি তার কোন কথার উত্তর দিতাম না। এক বছর তার সঙ্গে কাটিয়ে মনে হচ্ছিল, আমার ব্যক্তিত্বের কণামাত্র আর অবশিষ্ট নেই।

'যাই হোক, সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেই দেখি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে রজনী। তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

'রজনীর চোখ দুটো লালচে, অপ্রকৃতিস্থ। চুলগুলো আলুথালু হয়ে পিঠময় ছড়ানো। মনে হচ্ছিল, তার ওপর যেন ডাকিনী ভর করেছে। স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখেছিল রজনী। তারপর সুর টেনে টেনে বলেছিল, 'এই জন্যেই তোমার ফিরতে রোজ দেরি হয়ে যায়।'

'ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা মুখে-চোখে ফুটে উঠতে দিই নি। যতটা সম্ভব শান্ত গলায় বলেছিলাম, 'কী জন্যে?'

'রজনী এবার বলেছিল, 'জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না! বে-শরম কোথাকার!'

'বলেছিলাম, 'শুধু শুধু আমাকে গালাগাল দিচ্ছ কেন?'

'শুধু শুধু!' মুখ ভেংচে রজনী বলেছিল, 'সুধা সিংহ কে?'

'আমার চারধারে পৃথিবী তখন দুলতে শুরু করেছে। কোনরকমে বলতে পেরেছিলাম, 'আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা, আমার সহকর্মী—'

'দাঁতে দাঁত চেপে রজনী বলেছিল, 'এই মাগীটা কলেজে তোমার সঙ্গে পড়ত ?'

'বলেছিলাম, 'ভদ্রভাবে কথা বল। মহিলা উচ্চ-শিক্ষিতা, অধ্যাপিকা।'

'ভেংচে ভেংচে রজনী বলেছিল, 'উচ্চশিক্ষিতা! অধ্যাপিকা! মাগী বলাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল বুঝি, বড্ড প্রেম! কলেজের ছুটি হলে ওর সঙ্গে লীলা চালিয়ে বুঝি বাড়ি ফেরা হয়! দুশ্চরিত্র, বদমাস।'

'প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, 'এসব কথা তোমায় কে বললে ?'

'ছুটে একটা চিঠি এনে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল রজনী, 'পড়—পড়, নিজের কীর্তির কথা পড়ে দ্যাখো।'

'চিঠিটা না তুলেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা কার কাজ। মহেশ-প্রসাদের সঙ্গে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করি নি। অথচ আমার চরম সর্বনাশ করে যাচ্ছে সে। কেন? কেন? মহেশপ্রসাদ কি সুধাকে মনে মনে চেয়েছিল? হয়তো, হয়তো—কিন্তু তার জন্য আমার সঙ্গে এই শত্রুতা কেন?

'আমি কোন কথা বলি নি। কিন্তু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছিল রজনী, 'মাগী বলাতে বাবুর রাগ হয়েছে। মাগী তো ভাল কথা, রেণ্ডি—একটা আস্ত বেশ্যা ওটা—'

'কোনদিন কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ করি নি। রজনীর সব অপমান চিরদিন মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। কিন্তু সেদিন আর পারি নি। আমার আহত ক্ষতবিক্ষত পৌরুষ সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিলাম, 'কাকে তুমি বেশ্যা বলছ! অসভ্যতার একটা সীমা আছে।'

রজনী বলেছিল, 'আমি অসভ্য! আমি অসভ্য!'

'সেদিন আমি যেন মরীয়া হয়ে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম, 'হাজারবার অসভ্য। চোদ্দ গুষ্টিতে কেউ কোনদিন লেখাপড়া শেখো

নি। কথাবার্তা রুচি এই রকমই তো হবে। এর চাইতে ভাল কিছু আশা করাই অন্যায়।'

'আমি যে এভাবে বলতে পারি রজ্‌নী ভাবতে পারে নি। প্রথমটা সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়েছিল, 'আমার গুষ্টি তুলে কথা বললে ?'

'আমাকে যেন জেদে পেয়ে গিয়েছিল। এতদিনের অসম্মান বুকের ভেতর কোথাও বারুদ হয়ে জমে ছিল। সেটাই বিস্ফোরণের মতন সেদিন বেরিয়ে এসেছে, 'হ্যাঁ, বললাম—'

রজ্‌নী বলেছিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, বাবাকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি। এর শোধ যদি না তুলি আমি বাপের বেটি না।' তক্ষুণি চাকর পাঠিয়ে নওলকিশোরজীকে ডাকিয়ে এনেছিল সে।

'মেয়ের কাছে সব শুনে রক্তচক্ষে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন নওলকিশোরজী। তারপর গর্জে উঠেছিলেন, 'লুচ্চা বদমাস, রাস্তায় রাস্তায় বেলেল্লাপনা করে বেড়াবে আর আমার মেয়ের ওপরেই চোখ রাঙাবে! আবার তার গুষ্টি তুলে কথা বলবে!'

'আমি বলেছিলাম, 'আপনার মেয়েই আমার ওপর চোখ রাঙায়। আর বেলেল্লাপনা কে করে ? ওসব বাজে কথা।'

'নওলকিশোরজী ধমকে উঠেছিলেন, 'চোপরও উল্লু, জুতিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব।'

'আমি হতবাক, 'কাকে আপনি কী বলছেন!'

'নওলকিশোরজী তাড়া করে এসেছিলেন, 'তোকে রে গুলাম কা বাচ্চা, তোকে—'

'বলেছিলাম, 'বাপ তুলে কথা বলবেন না।'

'নাক কুঁচকে আমার গায়ে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিলেন নওলকিশোরজী, 'বাপ! ক' হাজার টাকার জন্যে শালাকে জেলে যেতে হত, সেই বাপের বড়াই!'

'আমার গায়ে যেন আগুনের হল্কা এসে লাগছিল। বলেছিলাম,

'আপনার টাকা আমি ফেরত দিয়ে দেব। কিন্তু খবরদার আমার সম্বন্ধে আর একটা বাজে কথাও শুনতে রাজী নই।'

'নওলকিশোরজী টেনে টেনে হেসেছিলেন, 'টাকা ফেরত দিবি তুই কোত্থেকে? দুশো টাকা তো মাইনে পাস। আর যে টাকা আমি একবার দি তা আর ফেরত নিই না। আট হাজার টাকা আমার একবারের পেচ্ছাবের দামও না। সেটা তোর বাপের মুখে মুতে দিয়ে এসেছিলাম।'

'হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতন চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'নওলকিশোরজী—'

'নওলকিশোরজীর দেহের সমস্ত রক্ত চোখে গিয়ে জমা হয়েছিল যেন। মনে হচ্ছিল, সে দুটো ফেটে যাবে। গলার শির দড়ির মত ফুলে উঠেছিল। হাত-পা থর থর কাঁপছিল। উন্মাদের মত চেঁচাতে চেঁচাতে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমার বাড়িতে থেকে আমার ওপরেই চোখ লাল করবি! বেরোও জানোয়ারের ছানা, বেরোও। আভি নিকালো—' বলে পা থেকে জুতো খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

'জুতোটা এসে লেগেছিল আমার মুখে; ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল। সেই মুহূর্তে আমি যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না। আমার সামনের পৃথিবী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

'জীবনে এরকম অপমানিত আগে আর কখনও হই নি। স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই অবস্থায় কি করব, কি করা উচিত—ভাবতে পারছিলাম না। ভাবনার শক্তিটাই আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

'নওলকিশোরজী আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'হারামজাদা বদমাস, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস!' বলেই ডেকেছিলেন 'রামখেলন—' রামখেলন ও বাড়ির দারোয়ান। ডাকা মাত্র সে ছুটে এসেছিল। নওলকিশোরজী বলেছিলেন, 'ওর গর্দানা পাকড়ে বাড়ির বার করে দিয়ে আয়।'

'রামখেলন হতভম্ব। হাজার হোক, আমি ও বাড়ির জামাই:

মালিক হুকুম দিলেও সোজা আমার ঘাড়ে হাত ছোঁয় কী করে! সে ইতস্তত করছিল।

'অপমানটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করলেন, চিরদিন তা আমার মনে থাকবে। দারোয়ান দিয়ে বার করে দিতে হবে না ; আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা শুনে রাখুন—'

'নওলকিশোরজীর গলা সপ্তমে চড়েই ছিল। বলেছিলেন, 'কী—কী বলবি রে উল্লুর বাচ্চা?'

'আপনার মেয়ের সঙ্গে আজ থেকে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কে তোকে সম্পর্ক রাখতে বলছে! বুঝব আমার মেয়ে বিধবা।'

'ও বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে এসেছিলাম। রাস্তায় এসে মনে হচ্ছিল, আমার চারদিক ঢেউয়ের মতন দুলছে। কোথায় যাব, কী করব—ভাবতে পারছিলাম না। আমার সামনে কোন গন্তব্য ছিল না। অন্ধের মতন জ্ঞানশূন্যের মতন টলতে টলতে শুধু হাঁটছিলাম। পাটনা শহরের পরিচিত রাস্তাগুলো ভয়ানক অচেনা মনে হচ্ছিল। কেউ যেন চোখ বেঁধে আমাকে এক অজানা রহস্যময় দেশে ছেড়ে দিয়ে গেছে।

'হাঁটতে হাঁটতে কখন কিভাবে যে সুধাদের বাড়ি চলে এসেছিলাম মনে নেই। আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে সুধা চমকে উঠেছিল। বলেছিল, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কি হয়েছে, তাকে সব বলেছিলাম।

'সুধা কোন মন্তব্য করে নি। সেই দিনটা আমাকে তাদের বাড়ি রেখে পরের দিন একটা ভাল হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আশা করি এতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ও বাড়ি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আর কোন মোহ তোমার নেই!'

'সত্যিই শিক্ষা হয়েছিল, মোহও আর ছিল না। সুধার কথায় সায় দিয়ে ক্লান্তভাবে মাথা নেড়েছিলাম।

'সুধা বলেছিল, 'এবার তা হলে ব্যবস্থা করি ?'

'সে কোন্ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিল, বুঝতে অসুবিধে হয় নি। সুধা আমাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়। চিরদিন সে দিয়েই এসেছে, তার বদলে কিছুই পায় নি। তাকে বাধা দেবার মতন শক্তি আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না।

'একান্তভাবে সুধা যা চেয়েছিল তা-ই পেতে যাচ্ছিল তখন তার কত উৎসাহ ! নিজের বিয়ের যোগাড়যন্ত্র শুরু করেছিল সে। এ বিয়েতে তার বাবার আপত্তি ছিল না। মেয়ে সুখী হলেই তিনি সুখী।

'সে আমলে হিন্দু-সমাজে একাধিক বিয়ে করা চলত ; আইনের চোখে তা দণ্ডনীয় ছিল না। যৌবনের শুরু থেকে সমস্ত মনপ্রাণ আর অস্তিত্ব দিয়ে যাকে কামনা করেছিলাম, তাকে পেতে চলেছি। তবু আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছিল। রজনীকে আমি পুরোপুরি ভুলতে পারছিলাম না ; ঘুরে ফিরে তার মুখ আমার চোখের সামনে এসে স্থির হচ্ছিল। প্রাণপণে আমার স্মৃতি থেকে সত্তা থেকে রজনীকে মুছে দিতে চাইছিলাম, দুঃস্বপ্নের মতন দু বছরের বিবাহিত জীবনকে ভুলতে চাইছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না।

'বিয়েটা হয়েই যেত। কেননা রজনীর মুখ ঘুরে ঘুরে যতই দেখা দিক, সুধার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি গভীর আর তীব্র। আমার সমস্ত সত্তাকে উন্মুখ করে সে তখন তার দিকে আমাকে টানছে। রজনীর সাধ্য কি দু বছরের অপ্রীতিকর বিবাহিত জীবনের স্মৃতি দিয়ে আমাকে ধরে রাখে।

'বিয়েটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না। বলতে ভুলেছি, রজনীদের বাড়ির একটা লোক আমাকে খুব ভালবাসত ; তার নাম ঢোড়াই, ও বাড়ির চাকর ; বহুকাল ওখানে থেকে থেকে সংসারের একজন হয়ে গেছে।

'আমি বিদ্বান, কলেজে পড়াই—ঢোড়াইয়ের কাছে এটা দারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার। ও-বাড়ি থেকে চলে আসবার আগে সবসময় অবাক চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। ভালও যেমন বাসত, তেমনি

ভক্তিও করত ঢোড়াই। রজ্‌নীর সঙ্গে আমার যে বনিবনা হচ্ছিল না, সেটা ওর খুব খারাপ লাগত। লক্ষ্য করতাম, ওর মুখ-চোখ বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আড়ালে নিয়ে রজ্‌নীকে বোঝাতে বসত ঢোড়াই, কিন্তু বৃথাই।

'যাই হোক, আমি ও বাড়ি থেকে চলে আসার পর একেবারে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল ঢোড়াই। রোজই দুবেলা করে আমার হোটেলে আসত আর বলত, 'দোহাই জামাইবাবু, আপনারা একটু মানিয়ে নিন। আপনি ও-বাড়ি চলুন—' বলত আর কাঁদত।

'আমি বলতাম, 'এত অপমানের পর ও-বাড়ি ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'এই ভাবেই চলছিল, এদিকে সুধার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছিল। ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঢোড়াই কিভাবে জানতে পেরেছিল কে জানে। মনে পড়ে, বিয়ের ক'দিন আগে সে এসে হাজির। তাকে উন্মাদের মতন দেখাচ্ছিল। ঢোড়াই বলেছিল, 'এ আপনি কী করছেন জামাইবাবু? এ বিয়ে হতে পারে না।'

'আমি বলেছিলাম, 'কেন হতে পারে না?'

'ভেবেছিলাম, ঢোড়াই হয়ত বলবে, আমার মতন বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের এক স্ত্রী থাকতে হঠকারিতার বশে আরেকবার বিয়ে করা উচিত না। রজ্‌নী অশিক্ষিতা, তার বাবা অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—এ সবই ঠিক। তবু রজ্‌নীকে এত বড় শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু এসব কিছুই বলে নি ঢোড়াই। সে যা বলেছিল তা এইরকম, 'জামাইবাবু, রজ্‌নীদিদির পেটে তোমার বাচ্চা আছে—' এর বেশি আর কিছুই বলতে পারে নি।

'কিন্তু ওইটুকুতেই কাজ হয়ে গিয়েছিল। রজনী যে সন্তান-সম্ভবা আগে জানতাম না। আমার শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে ঝন্‌ ঝন্‌ করে কি যেন ভাঙতে শুরু করেছিল।

'এরপরও অনেকক্ষণ একটানা কী বলে গিয়েছিল ঢোড়াই, আমি

কিছুই শুনতে পাই নি। কখন সে চলে গিয়েছিল তা-ও টের পাই নি। আচ্ছন্নের মতন, অভিভূতের মতন, বিহ্বলের মতন আমি বসেই ছিলাম। মনে হচ্ছিল, রজনীর গর্ভের অদেখা এক প্রাণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ঠেলে সরিয়ে সুধার কাছে যাবার সাধ্য আমার নেই। অদৃশ্য শৃঙ্খলে রজনীর সঙ্গে সে আমাকে চিরকালের মতন বেঁধে ফেলেছে। সে শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি আমার ছিল না।'

'সেদিনই পাটনা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। না পালিয়ে উপায় ছিল না। সুধাকে কী বলব? তার সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াব।

'পাটনা থেকে পালিয়ে কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতন এদিক-সেদিক ঘুরেছি। তারপর ঝামুরিয়া ফরেস্টে চাকরি নিয়ে এলাম।

'দেখতে দেখতে বাইশ-তেইশ বছর কেটে গেল। জগতের কারো কাছে আমার আর কোন প্রত্যাশা নেই, জিজ্ঞাসা নেই। কোন ব্যাপারে দুঃখ নেই, বেদনা নেই। তবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে একটি কথা শুধু ভেবেছি। আপন রক্তবিন্দু দিয়ে যাকে আমি সৃষ্টি করে এলাম তাকে কি দেখতে পাব না? মনকে সব সময় বুঝিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আসবে, না এসে পারবে না। এতদিন পর সে এসেছে।'

নিজের কথা শেষ করে জানালার বাইরে তাকালেন চতুরলাল। সেখানে ঝামুরিয়া ফরেস্ট আগের মতনই ছায়াচ্ছন্ন, শীতল, নিঝুম। উত্তর দিক থেকে অল্প অল্প হাওয়া দিয়েছে। এই মুহূর্তে গাছের পাতা ডাল-পালা কাঁপছে। পাখিরা মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করছিল, তারপরেই তাদের কণ্ঠস্বর গভীর নৈঃশব্দের ভেতর ডুবে যাচ্ছিল। ঝিঁঝিদের সেই একটানা বিলাপটা অবশ্য আছে। অদৃশ্য পোকাগুলো অরণ্যের কোথায় বসে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে, কে জানে।

নয়না একদৃষ্টে চতুরলালের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই মানুষটি সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কত কথা শুনেছে সে। শ্রদ্ধা না, ভক্তি না—চতুরলাল সম্পর্কে তার মন বাইশ বছর ধরে বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে ছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে সব বিরূপতা ধুয়ে মুছে গেছে।

এই মানুষটি শুধু তারই জন্য সুধা সিংহকে বিয়ে করতে পারেন নি, হাজার অপমান সয়েও তাকে অস্বীকার করেন নি—এই কথাগুলো নয়না যতবার ভাবল, বুকের মধ্যে কোথায় যেন আবেগের নদী উথল-পাথল হয়ে দুলতে লাগল। নিজের অজ্ঞাতসারে কাঁপা গলায় সে ডেকে উঠল, 'বাবা—' ঝামুরিয়া ফরেস্টে আসার পর এই প্রথম চতুরলালকে তার 'বাবা' বলা।

চতুরলাল বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন। চমকে জানালার বাইরে থেকে মুখ ফেরালেন। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতন তাকিয়ে থাকলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে নয়নাকে বুকের ভেতর টেনে নিলেন। একটু পর নয়না অনুভব করল, তার মাথার ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। চকিতে সে মুখ তুলল। দেখল চতুরলাল কাঁদছেন। কিছু বলতে চেষ্টা করল নয়না, পারল না। বুকের অতল থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে এসে কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ করে রাখল।

ধরা-ধরা শিথিল গলায় চতুরলাল বললেন, 'ডাকলি কেন মা ?'

নয়না উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ নীরবতা। তারপর চতুরলাল আবার বলে উঠলেন, 'বাইশ বছর ধরে তোর মার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, সম্পর্ক নেই। কিন্তু তুই তার সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছিস।'

নয়না চুপ।

চতুরলাল বলতে লাগলেন, 'কত কাল তাকে দেখি না, বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। কেমন আছে তোর মা ?'

নয়নার মনে হল, মায়ের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন চতুরলাল মিশ্র। খুব আস্তে সে বলল, 'মা ভালই আছে।'

'তোরা তোর মামাবাড়িতেই আছিস তো ?'

'হ্যাঁ।'

চতুরলাল আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

নয়নার একবার ইচ্ছে হল বলে, 'আপনি মা-র কাছে যাবেন?' কিন্তু বলতে পারল না। বললে চতুরলাল যাবেন কি না, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। তাছাড়া এতকাল পর মা-ই বা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবেন, কে জানে!

চার

খাওয়া-দাওয়ার পর নয়না অস্থির হয়ে উঠল, 'এবারে আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

করুণ গলায় চতুরলাল বললেন, 'এখুনি যাবি?'

'হ্যাঁ।'

চতুরলাল আর বাধা দিলেন না। বললেন, 'চল, তোকে স্টাডি-ক্যাম্পে দিয়ে আসি।'

চতুরলাল যদি তাঁর সঙ্গে স্টাডি ক্যাম্প পর্যন্ত যান, নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্ভাবনা। প্রফেসর-ইন-চার্জ কত গণ্ডা যে প্রশ্ন করবেন তার ইয়ত্তা নেই। জবাবদিহি করতে গিয়ে গোপন পারিবারিক ব্যাপার প্রকাশ হয়ে যাবে।

নয়না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।'

চতুরলাল বললেন, 'তাই কখনো হয়।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'না রে, আমি তোর সঙ্গে যেতে পারছি না। একটা জরুরী কাজ আছে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বরং ধানোয়ারকে তোর সঙ্গে দিয়ে দি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল নয়না। ভাবল, খানিকটা গিয়ে কোন এক অজুহাতে ধানোয়ারকে ফিরিয়ে দেবে।

চতুরলাল বললেন, 'কাল আবার আসবি তো?'

'দেখি।'

'দেখি না, আসতেই হবে। যে ক'দিন স্টাডি-ক্যাম্পে আছিস, রোজ আসবি। নইলে—'

'নইলে কী?'

'আমি নিজেই স্টাডি-ক্যাম্পে চলে যাব।'

রোজ রোজ স্টাডি-ক্যাম্প থেকে সবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে চলে আসা সহজ নয়। নয়না বলল, 'আসতে চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা-টেষ্টা নয়, আসবিই। আমি তোর আশায় পথ চেয়ে থাকব।' চতুরলাল বলতে লাগলেন, 'জীবনে কিছুই প্রায় পাই নি নয়না। এতকাল পর যদিই বা এলি, একবার দেখা দিয়েই চলে যাস না মা। আমার ভীষণ কষ্ট হবে।'

বিচিত্র এক কাঙালের মতন দেখাচ্ছে চতুরলালকে। স্টাডি-ক্যাম্পে যা হবার হবে, প্রতিদিন ঝামুরিয়া ফরেস্টে না এসে পারবে না নয়না। সে বলল, 'আমি আসব।'

এরপর ধানোয়ারকে ডেকে নয়নার সঙ্গে দিয়ে দিলেন চতুরলাল।

ঝামুরিয়া ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে নয়না যখন টিলার রাজ্যে ফিরে এল, আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনটা হেলে পড়েছে। পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের তাপ ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছে।

ধানোয়ার পাশাপাশি হাঁটছিল। আষাঢ়ের এই অবেলা, জুড়িয়ে আসা রোদ, ধানোয়ার কিংবা আদিগন্ত টিলার রাজ্য—কোনদিকে লক্ষ ছিল না নয়নার। অন্যমনস্কের মতন সে পা ফেলছিল। সুধা সিং, নওলকিশোরজী, চতুরলাল, তার মা—কত কথা যে মনের ভেতর ভিড় করে আসছিল। এসব যেন সত্যি না। বহুকাল আগে পড়া কোন রহস্য-কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মতন নয়নার স্মৃতির ভেতর তারা ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ভারি অবাক হয়ে গেল নয়না। মামা-বাড়িতে লেখাপড়ার চল ছিল না। তবু মা দাদুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাকে বিদুষী করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন? নিজে লেখাপড়া

শেখেন নি মা। আর তা সম্ভবও ছিল না। নিজে তো পারেন নি, মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে তিনি কি সুধা সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিলেন ? মায়ের মনোভাব বোঝবার উপায় নেই।

কতক্ষণ হেঁটেছিল, মনে নেই। একসময় কে যেন ডেকে উঠল, 'নয়না—'

চমকে এদিক-সেদিক তাকাতেই দেখা গেল একটা টিলার আড়াল থেকে জয়ন্ত বেরিয়ে আসছে। চোখোচোখি হতেই হাতজোড় করল জয়ন্ত, আর নয়নার ভ্রূ কুঁচকে গেল।

কাছাকাছি এসে মুখ কাঁচুমাচু করে জয়ন্ত বলল, 'প্লীজ—'

নয়না বলল, 'এ কি, তুমি স্টাডি-ক্যাম্পে ফিরে যাও নি ?'

'না।'

'কেন ?'

ধানোয়ারের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বলল, 'সব বলব, তার আগে তোমার বাহনটিকে বিদেয় কর।'

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। নয়না ধানোয়ারকে বলল, 'তুমি এবার যাও, আমি চলে যেতে পারব।'

ধানোয়ার কোন প্রশ্ন না করে চলে গেল।

তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে জয়ন্তকে বিদ্ধ করতে করতে নয়না বলল, 'এবার বল, কেন স্টাডি-ক্যাম্পে ফের নি ?'

জয়ন্ত বলল, 'তোমার জন্যে।'

'তার মানে ?'

'তোমাকে একলা ফেলে আমি স্টাডি-ক্যাম্পে ফিরতে পারি না।'

নয়না সংশয়ের চোখে তাকাল। তার পিছু পিছু ঝামুরিয়া ফরেস্ট পর্যন্ত গিয়েছিল নাকি জয়ন্ত ? এই প্রশ্নটা না করে বলল, 'তোমাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই ?'

'তা বলেছ।'

'তবে ?'

'আমার ধারণা ব্যাপারটা তুমি রি-কনসিডার করবে।'

নয়না হেসে ফেলল। নাঃ, জয়ন্তর সঙ্গে পারবার যো নেই। প্রথম আলাপের পর থেকেই তা বোঝা গেছে।

দুজনের মন দেয়া-নেয়ার খেলা অনেক হয়েছে। মনঃস্থিরও তারা করে ফেলেছে। বাকি আছে শুধু বাড়িতে জানানো। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। কেন না নয়নারা গোঁড়া শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। জয়ন্তরা ব্রাহ্মণ হলেও বাঙালী, তার ওপর মাছ খায়। এত বড় দুটো পাহাড় ডিঙানো কি করে যে সম্ভব হবে, কে জানে

সে যাই হোক, জয়ন্ত বলল, 'আদিবাসীটা গেছে। এবার আমিই তোমার বাহন হই। চল

'চল।'

দুজনে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে নয়না বলল, 'স্টাডি ক্যাম্পে তো ফের নি, ছিলে কোথায়?'

জয়ন্ত বলল, 'এই মাঠে-ঘাটে।'

'খেয়েছ কি?'

'বিশুদ্ধ বায়ু।'

'এর কোন মানে হয়! শুধু শুধু না খেয়ে নিজেকে কষ্ট দেওয়া।

জয়ন্ত উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ জয়ন্ত বলল, 'আচ্ছা--'

'কী?' নয়না উন্মুখ হল।

'ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক তোমার কে হন?'

'কার কথা বলছ?'

'ঐ যে ঝামুরিয়া ফরেস্টের; সারা দুপুর যাঁর কাছে কাটিয়ে এলে'

নয়না চমকে উঠল, 'তুমি ঝামুরিয়া ফরেস্টে গিয়েছিলে নাকি?'

'ইয়েস ম্যাডাম—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল জয়ন্ত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'উনি আমার বাবা।'

এবার জয়ন্তর অবাক হবার পালা, 'তোমার বাবা!'

'হ্যাঁ—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি না বলেছিলে, তোমার বাবার খোঁজ নেই? অনেকদিন আগে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। এতদিনে তাঁর খোঁজ পাওয়া গেছে।'

নয়নার মনে হল, জয়ন্তর কাছে সব কথা বলা উচিত। মা আর বাবার মধ্যে যে দূরত্ব আছে সেটা সরিয়ে দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসা দরকার, সে ব্যাপারে জয়ন্ত নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারে।

নয়না বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে— খুব মন দিয়ে শুনতে হবে।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে উদ্‌গ্রীব হল জয়ন্ত। বলল, 'মন দিয়েই শুনব।'

'আমার জীবনের একটা দিকের কথা তোমাকে বলি নি। সব শুনে বল, আমি কী করব—'

উৎসুক চোখে তাকিয়েই থাকল জয়ন্ত।

নয়না তার মা-বাবার কাহিনী আগাগোড়া বলে গেল। কিছুই লুকলো না, গোপন করল না। সব বলবার পর একটু থেমে আবার শুরু করল, 'মা-বাবা, দু'জনেই সারা জীবন খুব কষ্ট পেয়েছেন। আমার ইচ্ছে, এই শেষ বয়সে ওঁরা একসঙ্গে থাকুন। একটু শান্তি ওঁদের দরকার। কি করে দু-জনকে মেলাব ভাবতে পারছি না। তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পার?'

নয়নার কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও—'

সন্ধ্যের খানিক আগে তারা স্টাডি ক্যাম্পে এসে পড়ল।

পাঁচ

কারোকে কিছু না জানিয়ে নয়না আর জয়ন্ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এসেছে। এ জন্য তারা কী জবাবদিহি করেছে অথবা শাস্তি পেয়েছে কিনা—সে সব ভিন্ন প্রসঙ্গ ; এ কাহিনীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

পরের দিন নয়না শুধলো, 'কিছু ভেবেছ ?'

জয়ন্ত বললো, 'হ্যাঁ।'

'কী ?'

'তোমার মাকে স্টাডি-ক্যাম্পে আনাতে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি, বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখান থেকে ঝামুরিয়া ফরেস্টে নিয়ে যেতে হবে।'

সংশয়ের গলায় নয়না বলল, 'মাকে এখানে আনব কী করে ?'

জয়ন্ত বলল, 'চিঠি লিখে, তোমার অসুখ করেছে—'

'কিন্তু—'

'কী ?'

'আমার তো সত্যিই অসুখ করে নি। তা ছাড়া মা না হয় এখানে এলেন, কিন্তু থাকবেন কোথায় ? প্রফেসর-ইন-চার্জকে এ ব্যাপারে কী বলব ?'

জয়ন্ত বলল, 'তাই তো—'

এরপর দু-জনে অনেক পরামর্শ হল। কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হয় না। চতুরলাল মিশ্রের সঙ্গে মায়ের মিলন ঘটানোর জন্য যত কৌশল তারা বোনে, তাদের প্রত্যেকটার মধ্যে একটা না একটা খুঁত থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, স্টাডি-ক্যাম্প থেকে বাড়ি ফিরে

যা হয় করা যাবে।

স্টাডি-ক্যাম্প মাসখানেকের মত চলল। রোজ তো আর সম্ভব না, এক মাসে প্রায় পনেরো দিন ঝামুরিয়া ফরেস্টে গেল নয়না।

* * * *

একমাস পর বাড়ি ফিরে নয়না মাকে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে মা।'

চিরকালের স্বল্পভাষিণী বিষাদময়ী মা অর্থাৎ রজনী খুব আস্তে করে শুধোলেন, 'কী?'

'তার আগে বল, রাগ করবে না।'

'রাগ করার মতন কিছু করেছিস নাকি?'

'সেটা তুমি বলবে—'

'বেশ। এখন যা বলতে চাইছিস, বলে ফেল—'

একটু চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে নয়না বলল, 'আমি ঝামুরিয়া ফরেস্টে গিয়েছিলাম।'

প্রথমটা রজনী বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'সেটা কোথায়?'

'আমরা যেখানে স্টাডি-ক্যাম্প করেছিলাম, তার কাছেই। সেখানে—'

'সেখানে কী?'

'বাবা থাকেন।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চকিতে মেয়ের দিকে তাকালেন রজনী। তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'তোকে না বলেছিলাম ওখানে যাবি না। আমি না বলার পরও গেলি! এত বড় সাহস তোর হল কোত্থেকে?'

নয়না বলল, 'না গিয়ে পারলাম না মা, আর—'

'আর কী?'

'আমার ইচ্ছে, তোমাকেও বাবার কাছে নিয়ে যাব।'

নয়নার কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না মা। চিৎকার করে উঠলেন, 'কী—কী বললি?'

আগে যা বলেছে, আরেকবার তা-ই বলল নয়না।

তীব্র উত্তেজিত স্বরে মা বলতে লাগলেন, 'এত আস্পর্ধা তোর ; আমাকে ঐ লোকটার কাছে নিয়ে যেতে চাস ! তোর লজ্জা হয় না, ঘেন্না হয় না ! লোকটা বেজাতের একটা মেয়েকে বিয়ে করে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই নয়না চেঁচিয়ে উঠল, 'না জেনে-শুনে কী বলছ মা ! বাবা আর বিয়ে করেন নি।'

'বিয়ে করে নি ?'

'না।'

মায়ের দুঃখটা কোথায়, প্রাণের কোন্ প্রান্তে তাঁর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—এতকাল পর হঠাৎ যেন বুঝতে পারল নয়না। চতুরলাল মিশ্র কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন, এক নিশ্বাসে সে বলে গেল। বলল, 'বাবার বড় কষ্ট মা ; একা একা সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন।'

শুনতে শুনতে মায়ের মুখ-চোখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। বিহ্বলের মতন আচ্ছন্নের মতন তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

নয়না বলতে লাগল, 'মনের ভেতর শুধু শুধু রাগ নিয়ে দুঃখ নিয়ে বসে থাকলে চলবে না মা। তাতে আমাদের সবার ক্ষতি। যা হবার তা তো হয়েই গেছে ; এখন আমাদের ঝামুরিয়া যেতে হবে। তোমার জন্যে আমার জন্যে বাবা সেখানে অপেক্ষা করছেন।'

মা কিছু বললেন না ; ধীরে ধীরে সামনে থেকে উঠে গেলেন।

নয়না বুঝল, এখন আর মাকে কিছু বলা ঠিক হবে না। মা এখন একটু একলা থাকুন, নির্জনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

ছয়

স্টাডি-ক্যাম্প থেকে ফেরার পর মায়ের সঙ্গে চতুরলালের ব্যাপারে যে কথাবার্তা হয়েছিল তারপর দুটো দিন পার হয়ে গেছে। এর ভেতর

নয়না আর কিছু বলে নি ; চুপচাপ মাকে লক্ষ্য করে গেছে।

তৃতীয় দিন সকালবেলা মা বললেন, তুই সত্যি বলছিস তো ?'

নয়না বুঝতে পারে নি। বলল, 'কী ?'

'তোর বাপ সেই মেয়েছেলেটাকে বিয়ে করে নি ?'

'সত্যি—সত্যি—সত্যি। বাবা সত্যি বিয়ে করেন নি।'

একটু চুপ। তারপর মা বললেন, 'এখান থেকে কি করে ঝামুরিয়া যেতে হয়, তুই জানিস ?'

নয়না প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'তুমি বাবার কাছে যাবে মা ?'

মা উত্তর দিলেন না। তাঁর নীরবতার ভেতর উত্তরটা ছিল।

নয়নার মাথায় এবার চাতুরি খেলে গেল। ঝামুরিয়ার পথ তার চেনা। তবু বলল, 'আমি ঠিক চিনি না। তবে—'

'কী ?' মা উন্মুখ হলেন।

'জয়ন্ত চেনে।'

'কোন্ জয়ন্ত ?' বলে একটু ভাবতেই মায়ের মনে পড়ে গেল, 'ও, সেই বাঙালীদের ছেলেটা ? আমাদের বাড়ী ছেলেবেলায় খুব আসত না ?'

সত্যিই ছোটবেলায় নয়নাদের বাড়ি খুব যাওয়া-আসা ছিল জয়ন্তর, বড় হবার পর অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। দাদুরা প্রচণ্ড রক্ষণশীল না হলে যাতায়াতটা এখনও বজায় থাকত।

যাই হোক, মা বোধহয় বাবার চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন। নইলে জয়ন্ত সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাজার প্রশ্ন করতেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না।

নখ খুঁটতে খুঁটতে নয়না বলল, 'হাঁ—'

'সে কি আমাদের সঙ্গে ঝামুরিয়া যেতে পারবে ?'

যাবে আবার না ! পা তো বাড়িয়েই আছে জয়ন্ত। কিন্তু এ কথা বলা যায় না। নয়না বলল, 'একবার বলে দেখি—'

'ত্যাখ—'

*   *   *   *

দিন কয়েক পর খাড়া দুপুরবেলায় নয়না, তার মা আর জয়ন্ত ঝামুরিয়া ফরেস্টে এসে পৌঁছল। তারা যে আসছে, আগেই চতুরলাল মিশ্রকে তা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন চতুরলাল, খুব সম্ভব তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রজনী। নয়না লক্ষ করল, মায়ের হাত-পা-ঠোঁট থর থর করছে, সমস্ত শরীর যেন দুলছে। চোখের দৃষ্টি স্থির, করুণ, পলকহীন। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে আত্মসমর্পণের মত কী যেন ফুটে আছে। মায়ের মধ্যে এমন এক কাঙালিনী কোথায় যে লুকিয়ে ছিল, কে জানত।

চতুরলালও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। এক সময় তাঁর মুখ সস্নেহ কোমল হাসিতে ভরে গেল। খুব আস্তে করে ডাকলেন, 'এসো। ঘরে চল—'

রজনী কিছু বললেন না। স্বামীর সঙ্গে প্রায় টলতে টলতে বাংলোর ভেতর চলে গেলেন।

নয়না ভাবল, এখন ওদের একটু একলা থাকতে দেওয়া উচিত। জয়ন্ত আর সে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পর জয়ন্ত ডাকল, 'নয়না—'

আবছা গলায় নয়না সাড়া দিল।

জয়ন্ত আবার বলে উঠল, 'মা-বাবার মিলনটা তো বেশ ঘটিয়ে দিলে। এবার অধমের ওপর একটু করুণা কর।'

জয়ন্তর কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না নয়না। তার মনে হচ্ছিল, এবার থেকে মা আর সে হয়তো বাবার কাছেই থাকবে।

দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মাঝখানে সেতুবন্ধ হতে পেরেছে নয়না। তার খুব ভাল লাগছিল।